অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়

মিষ্টি জলে মাছ চাষ



মিষ্টি জলে মাছচাষ

অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়

ভূতপূর্ব রিসার্চ অফিসার

মৎস্য বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
নববর্ষ, ১৩৯৪
এপ্রিল, ১৯৮৭

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী
চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-২১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ২০ টাকা
(Rupees twenty only)

উৎসর্গ

বাবলুর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে—

বাবা



জন্ম : সোমবার, ২৮শে জুলাই ১৯৫২ মৃত্যু : সোমবার, ৭ই মার্চ ১৯৮৩

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

বি. এস্‌সি (অনার্স), এম. এস্‌সি (পার্ট ওয়ান—রসায়ন)

ভূমিকা

সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের কর্মজীবনের মধ্যে অন্তত ২৪—২৫ বছর বিভিন্ন মৎস্য ও মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ও গবেষণাকেন্দ্রে হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেই সুবাদে নানা ধরনের গবেষণামূলক কাজ করার এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যাচাই করে দেখারও অবাধ সুযোগ পেয়েছিলাম। বহুমুখী এইসব কাজের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কাজগুলি পরবর্তীকালে মাছচাষের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক কলাকৌশল উদ্ভাবনে সাহায্য করতে পেরেছে বলে মনে করি সেগুলি হলো—১৯৫৮ সালে জনপুটে (কাঁথির সন্নিকটে) কমন কার্প বা আমেরিকান রুই মাছের পশ্চিমবাংলায় সর্ব-প্রথম প্রজনন ও ডিমপোনার উৎপাদন (তদানীন্তন্ মৎস্য-মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর মহোদয় ও মৎস্য-বিভাগের ডাইরেক্টর ডাঃ কে. সি. সাহা ডি. এস. সি মহাশয়ের উপস্থিতিতে); ১৯৬১—৬২ সালে মাছচাষে মহুয়া খোল ব্যবহারের উপযোগিতা নিরুপণ এবং মৎস্যভূক মাছ নির্মূল করার জন্য এই খোল ব্যবহার করার উপযুক্ত মাত্রা নির্ধারণ; ১৯৬৩ সালে আঁতুড় পুকুরে ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য কেরোসিন তেল ব্যবহারের উপযোগিতা নিরুপণ এবং তেল ব্যবহারের উপযুক্ত মাত্রা নির্ধারণ; এবং ১৯৭৪ সালের ১৭ই জুলাই বিদেশী মাছ সিলভার কার্পের পশ্চিমবাংলায় সর্বপ্রথম প্রজনন ও ডিমপোনা উৎপাদন (নদীয়া জেলায় চাকদহের অনতিদূরে রানীনগরে গঙ্গানদীতে হাপা বসিয়ে কাজ করে)।

গবেষণামূলক এইসব কাজে এবং মাছচাষের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে কাজের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতার পুঁজি সঞ্চয় করে আগ্‌লে রেখেছিলাম তার সবটাই যথাযথ সদ্ব্যবহারের প্রয়াস করেছি 'মিষ্টি জলে মাছচাষ' শিরোনামের পুস্তক রচনায়। বস্তুত এই পুস্তকে মিষ্টি জলে বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের মাছচাষ সম্বন্ধে যেসব তত্ত্ব, তথ্য, চাষ-প্রণালী ও দৈনন্দিন কাজে মেনে চলার মতো সাধারণ নিয়মাবলীর কথা বলা হয়েছে তার প্রায় সবকিছুই হাতে-কলমে কাজে পরীক্ষিত সত্য এবং সেই কারণে বাস্তবক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে প্রয়োগযোগ্য।

সম্পূর্ণ বাস্তব প্রেক্ষাপটে রচিত এই পুস্তকটিতে এমন কয়েকটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে যেগুলি মাছচাষীদের কাছে পথ-নির্দেশিকার কাজ করবে বলে আশা করতে পারি। 'মাছচাষের পরিবেশ', 'বিভিন্ন ধরনের মাছচাষে

আয়-ব্যয়ের হিসাব', 'মাছচাষে অঙ্ক' ও 'মাছচাষে কিছু টোটকা ও টুকিটাকি' শীর্ষক অধ্যায়গুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'মাছচাষে অগ্রগতি ও কিছু চিন্তা-ভাবনা' শীর্ষক অধ্যায়টি মৎস্যবিজ্ঞানী ও গবেষকদের যে কিছুটা চিন্তার খোরাক জোগাতে সমর্থ হবে বিনীতভাবে সে প্রত্যাশাটুকুও করতে পারি।

এতসব বলার পরেও পুস্তকটি মিষ্টি জলে মাছচাষের কাজে কতটা উপযোগী বা সহায়ক হবে সে সম্বন্ধে শেষ কথা বলার অধিকার থাকছে অবশ্যই মাছচাষী ও মাছচাষে আগ্রহী ব্যক্তিদের, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় মাছচাষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের এবং ভবিষ্যতে মাছচাষকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের। পুস্তকটি এদের সকলের কাছে সমাদৃত হলে আমার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।

কর্মজীবনে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ও বিভাগের বাইরেও বহু গুণীজনের উপদেশ, পরামর্শ ও উৎসাহ এবং অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের সহৃদয় সহায়তা ও সহযোগিতা পেয়ে আমি ধন্য, আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়

'গৌতম স্মৃতি'
চ্যাটার্জী লেন
রানাঘাট, নদীয়া

সূচীপত্র

মাছচাষের স্বরূপ ও প্রকৃতি

ইংরিজি '৬০ বা '৬১ সাল হবে। মাছচাষ সম্পর্কীয় একটি উচ্চপদে প্রার্থী-বাছাই বোর্ডে চেয়ারম্যান একজন প্রার্থীর কাছে প্রশ্নাকারে জানতে চাইলেন, 'মাছচাষের জন্যে আবার সরকারী অফিসারের কী দরকার? বর্ষাকালে বাজার থেকে জ্যান্ত চারামাছ কিনে পুকুরে ছাড়া, আর দরকারের সময় জাল দিয়ে পুকুর থেকে মাছ ধরে খাওয়া, এই তো মাছচাষ।' মাছচাষ বলতে কী বোঝায়, মাছচাষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের প্রয়োজন বা অবকাশ আছে কী না এবং থাকলে, কতটা ও কীভাবে, প্রচ্ছন্ন-ভাবে হলেও, প্রার্থীর সম্ভাব্য উত্তর থেকে মাছচাষ সম্বন্ধে প্রার্থীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিমাপ করাই ছিল প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য। আবার, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত সংগত ও কালোপযোগী। মাছচাষ সম্বন্ধে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা ও জিজ্ঞাসা ঐ একটি প্রশ্নের মধ্যেই অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তারপর দীর্ঘ ২২-২৩ বছর কেটে গেছে। মাছচাষ সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণাও অনেক পাল্‌টে গেছে। বর্ষাকালে কেবল নদীর জলের স্রোতে ডিম ছাড়ে এমন সব মাছও আজ স্বচ্ছন্দে বাঁধে-ঘাটে, পুকুরে ডিম দিচ্ছে। ডিমপোনার চাষে আজ আর শিশুমাছ লাখে লাখে অকালে মরে না; দূরদেশে পাড়ি দেওয়ার পথে অপমৃত্যুও ঘটে না তাদের হাজারে হাজারে। সারা বছর চাষ করে বিঘা প্রতি ৮০ কেজি মাছের ফলন নিয়ে ঘরে ফিরতে হয় না এখন মাছচাষীকে; এক বিঘা আয়তনের পুকুর থেকে এক বছরে ৪০০ কেজি মাছ তোলা আজ আর মোটেই স্বপ্নকথা নয়, অতি বাস্তব ঘটনা।

এইসব সাফল্য নিঃসন্দেহে মাছচাষের ক্ষেতে বিরাট অগ্রগতির পরিচায়ক। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও মানতে হবে যে এই সাফল্য একদিনে আসেনি। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রের মতোই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতিই এনে দিয়েছে এইসব সাফল্য মাছচাষের নানা ধরনের বৈপ্লবিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। বস্তুতপক্ষে এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতি মাছচাষকে একটা ইন্‌ডাষ্ট্রি বা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে বলা যায়।

মাছচাষ বলতে তাই আজ আর শুধু পুকুরে মাছ ছাড়া আর ধরে খাওয়া বোঝায় না। যে কোন শিল্পের মতোই মাছচাষের ক্ষেত্রেও এখন প্রধান লক্ষ্য হলো উত্তরোত্তর উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি উৎপাদন বাজারে যোগান দিয়ে আয় বৃদ্ধি করা। আর, এই অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব একমাত্র মাছ চাষের নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তিকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে।

শিল্প ও কৃষিজাত বিভিন্ন ফসলের চাষের সঙ্গে মাছচাষের বেশ কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও অমিলের অঞ্চলটাও বেশ বড় আকারের। এর প্রধান কারণ হলো মাছচাষের জগৎটাই যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উৎপাদনের জন্য শিল্প যে কলকারখানা বা কৃষিতে যে ক্ষেত-খামারকে কাজে লাগাতে হয় তাদের তদারকি অপেক্ষাকৃত অনেক সহজসাধ্য এইজন্য যে সব কিছুই থাকে চোখের সামনে। কলকারখানার কোন যন্ত্রের কোন অংশ বিকল হলে সেটা সহজেই চোখে ধরা পড়ে। খামারের জমিতে ধানের চারা সবুজ না হয়ে হলদে হয়ে যাচ্ছে বা পাটগাছের পাতা পোকা নষ্ট করে দিচ্ছে এ জানতে বা বুঝতে বেশী দূর যেতে হয় না, বেশী সময়ও লাগে না। ফলে প্রতিকারও হয় স্বল্পায়াসে এবং বড় রকম কিছু ক্ষতি হওয়ার আগেই। কিন্তু মাছের চাষ নিবিড় জলে। পুকুরের পাড় থেকে চোখে দেখে বোঝার উপায় নেই, জলের ভেতর মাছ আছে কী নেই, থাকলে কী অবস্থাতেই বা

আছে—সুস্থ না রোগাক্রান্ত—পুকুরে দেওয়া সারের সুফল কতটা হলো, জলে মাছের পক্ষে ক্ষতিকর কোন গ্যাসের সৃষ্টি হয়েছে কী না, ইত্যাদি অনেক খবরই পাওয়া যায় না সহজে। এই সব খবর জানতে হলে পুকুরে জাল দিয়ে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখতে হয় মাছের কোন রোগ হয়েছে কী না, জল ও মাটি পরীক্ষা করে বুঝতে হয় পরিবেশ দূষিত হয়েছে কী না, সার প্রয়োগে সুফল হয়েছে কী না, ইত্যাদি। এই জাল দেওয়ার কাজটা সবক্ষেত্রেই যে নিয়মমত সঠিক সময়ের ব্যবধানে করা হয় তা মোটেই বলা যায় না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাছ বিক্রি করার তাগিদ ছাড়া এই ব্যাপারে মাছচাষীদের মধ্যে একটা গড়িমসিভাব লক্ষ্য করা যায়। জল, মাটি পরীক্ষা করানোর ব্যাপারে অসুবিধা তো আছেই। অনেক সময় মাছের স্বাস্থ্য বা পুকুরের জল এমন একটা বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারে যখন পুকুরে জাল দিয়ে বা জল, মাটি পরীক্ষা করেও মাছকে বিপদমুক্ত করার সময় পাওয়া যায় না, মাছ মরতে শুরু করে, কখনও কখনও বিশেষ প্রতিকূল অবস্থায় পুকুরের সব মাছই মারা যায়।

মাছচাষের কর্মকাণ্ড তাই বেশ জটিল। মাছচাষ সফলকাম হতে হলে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা যেমন দরকার, তেমনই দরকার হাতে-কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা। মাছচাষ একটি ফলিত বিজ্ঞান এবং পুকুরের আকার, প্রকার, জল, মাটি, পরিবেশ, চাষে ব্যবহৃত মাছের জাত, তাদের খাদ্যাভ্যাস এবং সর্বোপরি পরিচালনদক্ষতার তারতম্যে অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতা সকলের ক্ষেত্রে এবং সব ক্ষেত্রে কখনওই একই রকমের হতে পারে না। বস্তুতপক্ষে হাতে-কলমে কাজ করে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পুকুরের অবস্থাভেদে চাষের নানা ধরনের সমস্যা, তাদের সম্ভাব্য সমাধান, প্রতিকার, ইত্যাদি খুঁটিনাটি নানা প্রয়োজনীয়, মূল্যবান বিষয়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় তা মাছচাষের পুঁথিগত তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশী ফলপ্রসূ,

মাছচাষীর কাছে সেটাই আসল পুঁজি। এই পুঁজি ট্যাকে থাকে না, থাকে মগজে। এই পুঁজি যার যত বেশী, আর যে যত বেশী এই পুঁজি সঠিকভাবে খাটাতে পারবেন মাছচাষে তিনি তত বেশী লাভবান হবেন।

মাছচাষ বলতে অনেকেই পুকুরে বড় বড় সাইজের মাছ তৈরী করার কাজকেই বোঝেন। গ্রামবাংলার বর্তমান হালচাল সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে তারা কিন্তু জানেন আজকাল পুকুরে দীর্ঘদিন ধরে মাছ রেখে বড় করা কতটা দুঃসাহসিক ও দুঃসাধ্য কাজ। মাছ বেড়ে সামান্য ২০০-২৫০ গ্রাম ওজনের হয়ে উঠলেই পুকুরের মালিকের রাতের ঘুম চলে যায়। যে-কোনও দিন সকালে পুকুরপাড়ে গিয়ে হয়ত জানতে পারবেন, আগের দিন রাতে তার পুকুরে মাছ চুরি হয়ে গেছে। এরপর তিনি আর কোন্ ভরসায় পুকুরে মাছ পুষে রেখে বড় মাছ তৈরীর চেষ্টা করবেন? তাই অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল প্রায় সারা বছর ধরেই খুব ছোট সাইজেরও (২৫-৩০ গ্রাম) রুই, মৃগেল মাছের পোনা খাওয়ার মাছ হিসেবে কিনতে পাওয়া যায়। এর চেয়ে একটু বড় সাইজের রুই, মৃগেল ও কাতলার পোনা তো আছেই। চাহিদা ও যোগানের দিকে আর একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখলে এও বোঝা যায় যে মাছের ব্যবসার এই দিকটা এতদিন অজানা ও অবহেলিত থাকলেও অনিবার্য কারণে এর কদর আজকাল উল্লেখ-যোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে অপেক্ষাকৃত কিছুটা কম দামের এই সব ছোট সাইজের টাটকা পোনা মাছ মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ভাতের পাতে মাছ খাওয়ার সাধ ও স্বাদ মেটাতে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, বড় মাছের আকাশছোঁয়া দামের পরিপ্রেক্ষিতে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

মুখ্যত চুরির হাত থেকে মাছকে বাঁচানোর জন্যই এইভাবে ছোট সাইজের রুই, কাতলা, মৃগেল মাছ পুকুর থেকে তুলে বিক্রি করা হলেও, মাছচাষের এটা একটা বাস্তবসম্মত পদ্ধতিও বটে এবং

এর সীমারেখা হলো, ক্রেতারা কত ছোট সাইজ পর্যন্ত মাছ খাওয়ার জন্য পছন্দ করেন বা কিনতে রাজী থাকেন। মাঝে মাঝে পুকুর থেকে মাছ তুলে দিয়ে মাছের সংখ্যা কমিয়ে দিলে পুকুরের অবশিষ্ট মাছ বাড়তি জায়গা পেয়ে যে তুলনামূলকভাবে দ্রুত বাড়ে তা পরীক্ষিত সত্য। তাছাড়া ছোট সাইজের মাছ তৈরী করতে মাছ-চাষীর সময়, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বড় মাছ তৈরীর তুলনায় অনেক কম লাগে; একই পুকুর থেকে একই মরশুমে একাধিকবার ফসল তোলাও সম্ভব।

এই থেকে একটি জিনিষ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়—আধুনিক মাছচাষ শুধু বড় মাছ তৈরী করার চাষ নয়। যে কোন শিল্পের মতো মাছচাষ আজ বহুমুখী; আর, মাছচাষের এই বহুমুখীতাই একে একটি লাভজনক ও সম্মানজনক বৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত করেছে। শিক্ষিত বেকার যুবকেরা নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে এই লাভজনক বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন। প্রারম্ভিক পর্যায়ে অবশ্য কিছু অর্থের ও কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সরকারী আনুকূল্যে এই উভয় প্রকার সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

আধুনিক মাছচাষ বিভিন্ন ধরনের, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে এবং এই বিভিন্নতা থেকেই মাছচাষের বহুমুখীতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে-সব ধরনের মাছচাষ সমধিক প্রচলিত সেগুলি হলো ঃ

১) দেশী মাছ রুই, কাতলা, মৃগেলের ডিমপোনার চাষ ঃ—নদীর বা বাঁধের ডিমপোনা সংগ্রহ করে অথবা নিজ খামারে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে ডিমপোনা উৎপন্ন করে নিয়ে আঁতুড় পুকুরে চাষ।

২) বিদেশী মাছ সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কমন কার্পের ডিমপোনার চাষ ঃ—ডিমপোনা কিনে নিয়ে অথবা প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে উৎপন্ন করে নিয়ে আঁতুড় পুকুরে চাষ।

৩) ধানিপোনার চাষ ঃ—দেশী অথবা বিদেশী মাছের ডিমপোনা আঁতুড় পুকুরে চাষ করে উৎপন্ন ধানিপোনা লালন-পুকুরে ছেড়ে

চাষ—চারাপোনা উৎপাদনের জন্য। মাছের বীজ বিক্রির আড়ত থেকেও সরাসরি ধানিপোনা কিনে এনে লালন-পুকুরে চাষ করা যায়।

৪) চারাপোনার চাষ :—আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনার চাষে উৎপন্ন ছোট চারাপোনা লালন-পুকুরে ছেড়ে চাষ করে বড় আকারের চারাপোনা উৎপন্ন করা এবং লালন-পুকুরে ধানিপোনা চাষে উৎপন্ন ছোট চারাপোনাকে একই পুকুরে রেখে চাষ করে বড় আকারের চারাপোনার উৎপাদন। সরাসরি আড়ত থেকে ছোট চারাপোনা কিনে এনেও লালন-পুকুরে চাষ করে বড় আকারের চারাপোনা তৈরী করা যায়।

৫) বড় মাছের চাষ তথা মিশ্র মাছের চাষ :—দেশী ও বিদেশী মাছের বড় সাইজের চারাপোনা (৪-৫ ইঞ্চি) / চালাপোনা (আরও বড় সাইজের) পালন বা মজুত পুকুরে চাষ করে বড় মাছের (অন্তত ৭০০ গ্রাম ওজনের এবং তদূর্ধ্বের) উৎপাদন।

৬) মাগুর মাছের চাষ :—আঁতুড় পুকুর ও লালন-পুকুরে যথাক্রমে ডিমপোনা ও ধানিপোনা / চারাপোনার চাষের পর মাগুর মাছের চারা ছেড়ে অথবা অন্য যে-কোন অগভীর পুকুরে মাগুর মাছের ৫-৬ মাসের চাষ। একক বা অন্য প্রজাতির মাছের সঙ্গে মিশ্র চাষ করা যায়।

৭) গলদা চিংড়ির চাষ :—পুকুরে চিংড়ির চারা ছেড়ে একক চাষ অথবা অন্য প্রজাতির মাছের সঙ্গে মিশ্র চাষ।

৮) মাছের প্রণোদিত প্রজনন :—মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি-নির্যাস মাছের দেহে ইনজেক্শন করে মাছকে প্রজননের কাজে প্রণোদিত করা এবং প্রজনন করানো। প্রজননের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডিম বিশেষ প্রক্রিয়ায় ফুটিয়ে ডিমপোনা উৎপাদন এবং উৎপন্ন ডিমপোনা থেকে ধানিপোনা / চারাপোনা / চালাপোনা / বড় মাছ তৈরী করে বিক্রি।

বিভিন্ন প্রকৃতির হলেও মাছচাষের এই সব ধরন-ধারনের

পরস্পরের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির পরিপূরক বললেও ভুল হবে না। চাষের প্রস্তুতি ও প্রণালীর মধ্যেও প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট মিলও আছে। তবুও বলা যায় যে প্রতিটি ধরনের চাষই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনক বৃত্তি হিসাবে যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

মাছ চাষে সফল ও লাভবান হতে হলে মাছচাষীকে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি জানতে ও বুঝতে হবে সেটি হলো এই যে, তার পুকুর বা জলাশয়ের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার কীভাবে করা যেতে পারে। পুকুরের সংখ্যা, আকার, প্রকার, নিজের সামর্থ্য ও সর্বোপরি অভিজ্ঞতা ও পরিচালন দক্ষতার পুঁজি অনুযায়ী কোন্ ধরনের বা একাধিক কোন্ কোন্ ধরনের চাষ করলে অল্প ঝুঁকিতে এবং কম সময়ের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী লাভবান হতে পারেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা এবং আঞ্চলিক বিশেষ ধরনের চাহিদার কথাও চিন্তা করতে হবে। অনেকেই যে ধরনের চাষ করেন তাই করাই শ্রেয়, উৎপাদন বা লাভ-লোকসানের দিক থেকে বিচারে, তাকে মোটেই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে মনে করা যায় না। আর, এ কথাও তো ঠিক যে, কৃষিকাজ নিয়ে আমরা যতটা মাথা ঘামাই বা সময় ব্যয় করি তার একশো ভাগের এক ভাগও ব্যয় করি না মাছচাষের কাজে। এমন অনেকেই আছেন যারা পুকুরে মাছ ছাড়ার জন্য যে কোনও এক বাঁকীকে (হাঁড়িতে জল দিয়ে জ্যান্ত ছোট মাছ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে নিয়ে যায়) বলে দিয়েই কাজ শেষ করেন। বাঁকী পুকুরে কী মাছ ছাড়ল, ঐ মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেলের অনুপাতই বা কী, চারা মাছগুলি সুস্থ ও সবল কী না, এইসব দেখে, বুঝে নেওয়ার সময়টুকুও আমরা অনেকে দিতে চাই নে। এমনও হতে পারে, পুকুরে ছাড়া ঐ মাছের মধ্যে বেশীর ভাগটাই মৃগেলের চারাপোনা, সামান্য কিছু রুই, আর অতি সামান্যই কাতলা। এতে পুকুরের সব স্তরের প্রাকৃতিক খাদ্যের সদ্ব্যবহার হবে না, কারণ বিভিন্ন

প্রজাতির মাছ জলের বিভিন্ন স্তরে বাস করে—কাতলা ওপরের স্তরে, রুই মাঝের স্তরে ও মৃগেল নীচের স্তরে। এর ফলে উৎপাদন হবে ক্ষতিগ্রস্ত, যা হতে পারতো, হবে তার অনেক কম -পরিমাণে। দায় সারা এই রকম মাছচাষে না পাওয়া যায় উপযুক্ত ফলন, না দেখা যায় লাভের মুখ।

মাছচাষে লাভবান হতে হলে মাছচাষীকে তাই একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, কৃষিকাজের মতো বৃত্তিসুলভ মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। কৃষিকাজের মতোই চিন্তা-ভাবনা, পরিশ্রম, সময় ও অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত বা অপারগ হলে মাছচাষ সখের পর্যায়েই থেকে যাবে, নির্ভরশীল লাভজনক বৃত্তিতে পরিণত হতে পারবে না। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কৃষিজাত ধান, গম, পাট, শাকসব্জী, ফলমূল ইত্যাদি সব রকম ফসল বিক্রির জন্যই অল্প-বিস্তর বাজার খুঁজতে হলেও, অন্তত পশ্চিমবাংলায় মাছ বিক্রির জন্যে বাজার খুঁজতে হয় না; বরং বলা যায় এখানে বাজারই খুঁজে বেড়ায় মাছকে। আজ থেকে একশো বছর পরেও এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, রাজ্যের বর্তমান চাহিদা ও যোগানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধানের বাস্তব চিত্র এবং সর্বোপরি ভারতের প্রতিটি রাজ্যে প্রাণিজ প্রোটিন-বুভুক্ষ মৎস্যভোজীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কথা বিবেচনা করে।

মাছচাষের স্বরূপ, প্রকৃতি ও পরিধি সম্বন্ধে সবশেষে এই কথাই বলা যায় যে, অন্য যে-কোন ফলিত বিজ্ঞানের মতো মাছচাষ বিজ্ঞানও কতকগুলি মূলনীতি ও বহু পরীক্ষিত নীতি নির্দেশক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। হাতে-কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সব নীতি ও তথ্যকে যাচাই করা এবং প্রয়োজনবোধে অবশ্যই সংশোধন ও পরিবর্তন করা যেতে পারে মাছ-চাষে অধিকতর সাফল্য অর্জনের জন্য এবং তা করতে হলে চাষের বিভিন্ন ধরনের সর্বাধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ছাড়াও মাছ-

চাষীকে পুকুরের পরিবেশ, জল ও মাটির ভূমিকা, সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা, মাছের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পরিপূরক খাদ্য মাছের রোগ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধেও বিশদভাবে জানতে হবে, কারণ, প্রধানত এই সব বিষয়কেই কেন্দ্র করে মাছচাষের বিভিন্ন পদ্ধতি, নীতি ও নিয়মাবলীর উদ্ভব হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে।

সারাংশ

মাছচাষ বলতে পুকুরে ছোট চারাপোনা ছাড়া আর প্রয়োজনের সময় জাল দিয়ে মাছ ধরে খাওয়া, শুধু এই কথাই বোঝায় না।

আধুনিক মাছচাষের লক্ষ্য হলো অন্যান্য শিল্পের মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগে উত্তরোত্তর মাছের উৎপাদন বাড়ানো নিজের, দেশের ও জাতির স্বার্থে।

মাছচাষ বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতি এবং বহু পরীক্ষিত বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে মাছচাষীকে যেমন অবহিত হতে হবে, তেমনই হাতে-কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজন-বোধে নীতি ও পদ্ধতির সংশোধন এবং পরিবর্তন সাধন করে মাছচাষে অধিক লাভবান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। বস্তুতপক্ষে অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতাই মাছচাষীর সবচেয়ে বড় ও মূল্যবান পুঁজি, যদিও এই পুঁজি ট্যাঁকে থাকে না, থাকে মগজে।

বিভিন্ন শিল্পের মতোই আধুনিক মাছচাষও বহুমুখী, আর এই বহুমুখীতাই মাছচাষকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করে একে একটি নির্ভরশীল, লাভজনক ও সম্মানজনক বৃত্তির মর্যাদা দিয়েছে।

পুকুরের সংখ্যা, আকার, প্রকার, নিজের সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা ও পরিচালন দক্ষতার ভিত্তিতে এবং স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা ও

আঞ্চলিক চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মাছচাষের মধ্যে এক বা একাধিক ধরনের চাষ এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে অল্প সময়ের মধ্যে লাভের মুখ দেখা যায়। ছড়ার ভাষায় এই বিচারের মাপকাঠি হবে—যে পুকুর যেমন সাজের, চাষ চাই তেমন মাছের।

সব ফসলের ক্ষেত্রেই বিক্রির জন্যে অল্পবিস্তর বাজার খুঁজতে হয়, খুঁজতে হয় না শুধু মাছের ক্ষেত্রে, অন্তত পশ্চিমবাংলায় ; বরং বলা যায়, এখানে বাজার খুঁজে বেড়ায় মাছকে।

প্রচুর সম্ভাবনাময় এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক অবস্থায় সরকারের কাছ থেকে কিছু আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য নিয়ে শিক্ষিত বেকার যুবকেরা যদি নিঃসঙ্কোচে, মনে-প্রাণে মাছ-চাষকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলে অচিরেই তারা যে লাভবান হবেন এবং চাকরীর প্রতি তাদের অনাবশ্যক মোহ যে কেটে যাবে, সেকথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়।

•

মাছচাষের পরিবেশ

পুকুরের পাড়, আশপাশের জায়গা, পুকুরের জল ও তলদেশের মাটি—মোটামুটি এই নিয়েই মাছচাষের পুকুরের পরিবেশ। এদের মধ্যে আবার জল ও মাটিকে যেমন পরিবেশের উপাদান হিসেবে ধরা হয় তেমনি এরা নিজেরাও আবার পৃথক পৃথক ভাবে মাছচাষে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই বিচারে এদের যথেষ্ট কৌলিন্য আছে বলা যায় এবং স্বভাবতই মাছচাষে এদের ভূমিকা সম্বন্ধে মাছচাষীদের বিশদভাবে জানবার প্রয়োজন আছে।

মাছ জলে বাস করে, বাঁচবার জন্যে অক্সিজেন ও খাদ্য জল থেকে গ্রহণ করে, জলেই বড় হয়, আবার ঐ জলই কোনও কারণে দূষিত হলে অকালে মারা যায়। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই মাছচাষের পুকুরের জলের পরিচর্যা যেমন দরকার, তেমনি দরকার ঐ জলের নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং সেই অবস্থা বোঝবার মত জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

সফল মাছচাষ মানেই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, আর উৎপাদন বাড়াতে হলে পুকুরে মাছের খাদ্যের যোগান বাড়াতেই হবে—এর কোনও বিকল্প নেই। খাদ্য যোগানের এই কাজটি দু'ভাবে করা যেতে পারে—পুকুরের জলের উৎপাদন ক্ষমতা বা উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্ল্যাংকটন বা খাদ্যাণু পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরির ব্যবস্থা করে, অথবা, বাইরে থেকে ফিস্‌মিল (শুকনো মাছের গুঁড়ো), চালের কুঁড়ো, গমের ভূষি, সরষের খোল, বাদাম খোল ইত্যাদি খাদ্যবস্তু সরাসরি পুকুরে যোগান দিয়ে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্য বলা যায় যে এর একটিকে বাদ দিয়ে শুধু আর একটির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আশানুরূপ মাছের

উৎপাদন পাওয়া যায় না। বরং পুকুরে সৃষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্য ও বাইরে থেকে পরিপূরক খাদ্য হিসেবে দেওয়া কৃত্রিম খাদ্য, এই উভয়প্রকার খাদ্যের যোগান অব্যাহত থাকলে মাছের বৃদ্ধির হার দ্রুততর হয় এবং মাছের অন্তিম উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে।

এখন জানা দরকার পুকুরের জলের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি তথা মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্ল্যাংকটন বা খাদ্যাণুর বৃদ্ধি কীভাবে করা যায়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কৃষিকাজে উৎপাদনের মতো এই সব খাদ্যাণুর উৎপাদনেও জল, সূর্যের আলো, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন। জলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে তাতে এর ঘাটতির আশংকা নেই বললেই চলে। মাটিতে সাধারণত যে পরিমাণে পটাসিয়াম থাকে বাইরে থেকে এর যোগানের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। অভাব দেখা যায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামের। পুকুরে নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ ও চুণ ব্যবহার করে এই সব রাসায়নিক পদার্থের ঘাটতি পূরণ করা যায়। এ ছাড়াও জলের আরও কয়েকটি পদার্থগত ও রাসায়নিক গুণাগুণের ওপর জলের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি তথা মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধি নির্ভর করে।

পুকুরের পরিবেশমণ্ডলের অনেকটা অংশ দখল করে আছে পুকুরের পাড়। এই পুকুর-পাড় সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা দরকার। পাড়ে বাঁশ-ঝাড় বা বড় গাছ থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এদের পাতা জলে পড়ে ও পচে পুকুরের জলে অবাঞ্ছিত গ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে। তাই পুকুরের পাড়, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের পাড় গাছপালা থেকে মুক্ত রাখা দরকার। এতে সূর্যের আলো সারাদিন সরাসরি জলের ওপর পড়তে পারে, বায়ুমণ্ডলের বাতাস বিনা বাধায় জলের সঙ্গে সর্বক্ষণ মিশে মূল্যবান অক্সিজেন জলে দ্রবীভূত হতে পারে। সূর্যের আলো অবশ্য জলের অবস্থা বিশেষে সাধারণত ৭—৮ ফুট গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। স্বভাবতই এই

সীমা পর্যন্তই পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্ল্যাংকটনের উৎপাদন ও বৃদ্ধি সম্ভব। এইজন্যই মাছচাষের ধরন বা স্তর বিশেষে (ডিম-পোনার চাষ, বড় মাছের চাষ ইত্যাদি) পুকুরের গভীরতা ৭—৮ ফুটের বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অতিরিক্ত গভীর পুকুর ও বালি খাদে যে মাছ বাড়ে না তার কারণই হল এইসব জলে প্রাকৃতিক খাদ্যের স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয়, সূর্যের আলো তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারায়। আবার, পুকুর খুব বেশী মাত্রায় অগভীর হলে রোদের তাপে, বিশেষ করে মে-জুন মাসে, জল গরম হয়ে মাছের মড়কের কারণ হতে পারে। পাড়ের ওপর বা কাছের কোন খাটাল থেকে কিংবা আশপাশের কোন ময়লা জলের নর্দমা থেকে নোংরা জল সরাসরি যাতে পুকুরের জলে আসতে না পারে সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। পুকুর পাড়ে কলাবাগান করাও উচিত নয়, এতে পুকুরে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিতে পারে।

জলের গভীরতার মতো তাপমাত্রাও মাছচাষের পুকুরের পরিবেশের অন্যতম প্রধান উপাদান জলের একটি উল্লেখযোগ্য পদার্থগত অবস্থা এবং মাছচাষে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও আছে। বিশেষ করে মাছের প্রণোদিত প্রজননের ক্ষেত্রে জলের তাপমাত্রা একটি সীমা নির্দেশকারী কারণ হিসেবে কাজ করে। জলের ২৮° সেন্টিগ্রেডের বেশী তাপমাত্রায় মাছের প্রজনন ব্যাহত হয়। আমাদের দেশীয় মাছ রুই; কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি জলের তাপমাত্রার তারতম্যে বিশেষ অসুবিধায় না পড়লেও চীনদেশের ঠাণ্ডা জলের মাছ সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প গরমের সময় বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে, বিশেষ করে বর্ষা আসার আগের ৩—৪ মাসকাল। অনেক ক্ষেত্রে এই সময় এরা পুকুরে ব্যাপক হারে মারাও যায়। সুযোগ থাকলে এই সময় এদের অপেক্ষাকৃত গভীর পুকুরে রাখা এবং মাঝে মাঝে অগভীর নলকূপ থেকে পুকুরে নতুন জল দিয়ে জলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। মাছকে প্রজননক্ষম করে তুলতেও এই

প্রক্রিয়া সহায়ক হয়।

মাছচাষের পরিবেশের অপর মূল্যবান উপাদান হল জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন বা অম্লজান। জলের আলোড়নে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন বাতাসের সঙ্গে জলে মিশে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। মাছ শ্বাসকার্যের জন্য এই দ্রবীভূত অক্সিজেন জল থেকে নিয়ে জীবন-ধারণ করে। কম পরিমাণ দ্রবীভূত অক্সিজেনে খাদ্যের প্রাচুর্যের মধ্যেও মাছ আশানুরূপ বাড়ে না, যেহেতু এই অবস্থায় মাছের খাদ্যের প্রতি আসক্তি কমে যায়। দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণে দৈনিক তারতম্য ঘটা স্বাভাবিক। এই তারতম্য মাছের বৃদ্ধির ওপর প্রভাব বিস্তারও কমে। দৈনিক তারতম্যের সাথে গড় দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা লিটার প্রতি জলে ৪—৫ মিলিগ্রাম থাকলে মাছের ফলন ভাল হয়।

পুকুরে সবুজ উদ্ভিদকণা, শেওলাজাতীয় বা অন্য ধরনের জলজ উদ্ভিদ থাকলে এরা দিনের বেলায় বাতাস থেকে শোষণ-করা কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন গ্রহণ করে সূর্যের আলো ও জলের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের প্রয়োজনে খাবার তৈরী করে এবং অবশিষ্ট উপাদান অক্সিজেনকে পরিত্যাগ করে জলে। এই পরিত্যক্ত অক্সিজেন জলে মিশে দিনের বেলায় পুকুরে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। কিন্তু, যেহেতু শ্বাসপ্রশ্বাস কার্যক্রম আলোর দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং এই কাজ দিনরাত্রি ২৪ ঘণ্টা ধরেই চলে, সেইজন্য, দিনের আলোতে উদ্ভিদের দ্বারা তৈরী অক্সিজেন তারা (উদ্ভিদ) মাটি ও জলে বসবাসকারী অন্যান্য জীবাণু ও জীবের সঙ্গে টেনে নিতে থাকে দিনরাত। অনেক সময় বাতাসের সঙ্গে জলে মিশে যাওয়া দ্রবীভূত অক্সিজেনের মজুত ভাণ্ডারেও এরা ভাগ বসায়। এরপর মাত্র অবশিষ্ট অক্সিজেনটুকুই মাছ পায় তাদের শ্বাসকার্যের জন্য। রাতে সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ থাকে, ফলে উদ্ভিদ দ্বারা অক্সিজেন ভাণ্ডার তৈরীও বন্ধ থাকে। কিন্তু তাদের শ্বাসকার্য তো বন্ধ থাকে না। রাতে এই অবস্থায় পুকুরে মজুত অক্সিজেনের

পরিমাণ আর উদ্ভিদ, মাছ, মাটির জীবাণু ও জলের অন্যান্য জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণের মধ্যে সমতা বিনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে এবং এই সমতা নষ্ট হয়ে গেলে অক্সিজেনের অভাবে মাছ ব্যাপকভাবে মরতে শুরু করে। এই কারণেই পুকুরে জলজ উদ্ভিদ বা শেওলাজাতীয় উদ্ভিদের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা দরকার। মাত্রাধিক সবুজকণা ও শেওলা অনেক সময় জলের উপরিভাগে মোটা আস্তরণের সৃষ্টি করে। বাতাসের অক্সিজেন এই আস্তরণ ভেদ করে জলে মিশতে পারে না। এইরকম অবস্থায় কচুরীপানা বা টোপাপানা দিয়ে পুকুরের কিছু কিছু অংশ পরপর কয়েকদিন অন্তর ঢেকে দিলে ধীরে ধীরে পুকুরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

অক্সিজেনের অভাবে মাছ জলের ওপরে ভেসে উঠে ছট্‌ফট্ করতে থাকে। মে-জুন মাসে কয়েকদিন পরপর গুমোট আবহাওয়া চলাকালীন সময়ে সাধারণত শেষরাতে বা ভোরের দিকে এইরকম বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় কাছের অন্য কোন জলাশয় থেকে অথবা অগভীর নলকূপ থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে এই পুকুরে দিলে মাছকে বিপদমুক্ত করা ও বাঁচানো যায়। কয়েকদিন গুমোট আবহাওয়া চলাকালীন হঠাৎ বেশী মাত্রায় বৃষ্টিপাত হলেও মাছ সংকটজনক অবস্থায় পড়তে পারে। বায়বীয় অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়ার গতি দ্রুততর হয়। ফলে জলে কার্বনিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায় এবং অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। প্রায় ক্ষেত্রে জলের রং হঠাৎ খয়ের বা তামাক পাতার মত দেখায়, জলের ওপর বুদবুদ দেখা যায়। দ্রুত প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে না পারলে এ ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে মাছ মারা যায়, যদিও বৃষ্টিপাতের ফলে মাছের কিছুটা উপকার হবে বলেই মনে করা হয়। বাঁশ কিংবা লাঠি দিয়ে জলের বিভিন্ন জায়গায় ঘনঘন ঘা দিলে বায়ু-মণ্ডলের বাতাস দ্রুত এবং বিস্তৃত এলাকায় জলের সঙ্গে মেশার ফলে

দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় এবং মাছ ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে জলের নীচের দিকে যেতে আরম্ভ করে। বিঘা প্রতি ২০০—৫০০ গ্রাম পটাশ পারম্যাঙ্গানেট জলে গুলে পুকুরের সব জায়গায় ছড়িয়ে দিলে জলে অক্সিজেনের মাত্রা তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। এছাড়া পরবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে বিঘা প্রতি ৩০—৪০ কেজি কলিচূণ (কিস্তিতে ২-৩ দিনে) জলে গুলে পুকুরে ছড়িয়ে দিলে জল দোষমুক্ত হয়, জলের পি এইচ (অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নির্দেশক মান) বাড়ে এবং স্বাভাবিক নিয়মে অক্সিজেনের মাত্রাও বাড়তে থাকে।

প্রজননের ২—৩ মাস আগে বাছাই করা মাছকে পৃথক পুকুরে রেখে পরিচর্যাকালীন অবস্থায় জলে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে মাছের ডিম্বকোষ ও অন্তকোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি ব্যাহত হয়। অক্সিজেনের অভাবজনিত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বেশীদিন লড়াই করতে হলে মাছের ডিমধারণ ক্ষমতা ও প্রজনন ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সঠিক মাত্রা জানতে হলে কোন রসায়নাগারের সাহায্য নিতে হয়। বাস্তবক্ষেত্রে এই সাহায্য পাওয়া ও নেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। তাই কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য মাছচাষীকে নির্ভর করতে হবে নিজের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার ওপর। সাধারনত যে সব লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘাটতি নেই সেগুলি হল ঃ

(১) জলের পি. এইচ এর মান ৭.৫—৮.৬ এর মধ্যে ;

(২) মাছের চলাফেরা স্বাভাবিক, অর্থাৎ, মাছ জলের নীচেই চলাফেরা করে, ওপরের দিকে দলবদ্ধভাবে আসে না বা ভাসে না ;

(৩) বাইরে থেকে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হলে মাছ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে সেই খাদ্য খাওয়ার জন্য এবং খাদ্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য ছোটা-ছুটি শুরু করে দেয়,

(৪) মাছের দেহ উজ্জ্বল, কানকোর ভেতর ফুলকোর রং টকটকে লাল।

আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষের মূলনীতিই হল পুকুরে নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য ঘটানো এবং বাইরে থেকে পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্যের যোগান দেওয়া, যার সর্বশেষ ফল হল মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি। এইসব প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে জলের রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। পরিবর্তিত এইরকম অবস্থায় কোন কোন সময়ে পুকুরের জলের তাপমাত্রা ও গভীরতার বেশীরকম তারতম্যে অথবা পুকুরের তলদেশের মাটির জৈব পদার্থ বিভাজন করার ক্ষমতার তুলনায় পুকুরে সঞ্চিত জৈব পদার্থের তলানি বেশী হয়ে পড়লে, জলে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে অনেক ধরনের বিষাক্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়। এইরকম বিপজ্জনক অবস্থায় পুকুরে অনিবার্যভাবে মাছের মড়ক দেখা দেয়। সব ধরনের মাছচাষের ক্ষেত্রেই এইরকম অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকারক পরিবেশ মাছচাষীদের এড়িয়ে চলতে হয় এবং তারজন্য আগেভাগে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার হয়।

আমরা যেখানে বাস করি সেইসব ঘর-বাড়ি মাঝে মাঝে চূণকাম করতে হয়। এতে একদিকে যেমন বাড়ির সৌন্দর্য্য বাড়ে, তেমনি আবার রোগবীজাণু ও আরশোলা জাতীয় নানরকম পোকা-মাকড়ের উৎপাত কমে গিয়ে বাড়িতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একই অর্থে পুকুরই তো মাছের ঘর-বাড়ী। পুকুরেও তাই চূণকাম করতে হয়। তবে, আমাদের ঘর-বাড়ী বছরে একবার বা দুবার চূণকাম করলেই চলে, কিন্তু মাছের ঘর-বাড়ী চূণকাম করার দরকার হয় ঘনঘন। এর কারণ হলো, বসবাস, খাদ্য উৎপাদন, বাইরে থেকে খাদ্যের যোগান, খাদ্য গ্রহণ, মলমূত্র ত্যাগ, খাদ্যবস্তুর বিনাশপ্রাপ্তি ইত্যাদি মাছের জীবনের সঙ্গে জড়িত সবকিছু ক্রিয়াকলাপই একই নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে অতি

স্বাভাবিক কারণেই সেই ঘরের স্বাস্থ্য ও সুস্থ পরিবেশ প্রায়শই ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্যই মাছ ছাড়ার আগে পুকুরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তথা মাছচাষের অনুকূল অবস্থা তৈরী করে নিতে পুকুরে চূণ দিতে হয়। আবার, মাছ ছাড়ার পরেও মাঝে মাঝে চূণ দিতে হয় সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য, বিশেষ করে সার প্রয়োগের ৬-৭ দিনে আগে, সার থেকে বাঞ্ছিত সুফল যাতে পাওয়া যায়। 'মাছচাষের পুকুরে' চূণ যেসব অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে তা হল ঃ

(১) পুকুরের দূষিত পদার্থের নিরাময়করণ এবং এইভাবে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা ;

(২) পুকুরের জলের ও তলদেশের মাটির অম্লত্ব সংশোধন করা ;

(৩) ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করে তলদেশের মাটিতে অবস্থিত জীবাণুর কার্য-ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করা ;

(৪) তলদেশের মাটিতে নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করা।

পুকুরে প্রদত্ত সার ও তলদেশে সঞ্চিত জৈব পদার্থে (জলজ উদ্ভিদ ও জলজীবের দেহাবশেষ ইত্যাদি) মাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনেও এইসব জটিল পদার্থ প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগে না। পুকুরের তলদেশে অবস্থিত নানারূপ জীবাণু ও বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা মাটি এইসব জটিল পদার্থকে সরল পদার্থে রূপান্তরিত করে এবং সার ও জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টিকর মৌলিক পদার্থগুলিকে বিমুক্ত করে প্রয়োজনমত ধীরে ধীরে তাদের মুক্ত অবস্থায় জলে সঞ্চারিত করে। এইসব পুষ্টিকর মৌলিক পদার্থগুলিই (নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি) জলের উৎপাদন ক্ষমতা বা উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। পুকুরে সৃষ্ট মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য ও নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টির জন্য এইসব পুষ্টিকর মৌলিক পদার্থগুলির

ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই থেকে বোঝা যায় মাছের উৎপাদন সংক্রান্ত বিরাট ও জটিল কর্মকাণ্ডে পুকুরের তলদেশের মাটির ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে মাটির যে কার্য-ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তাকে উজ্জীবিত করতে ও অব্যাহত রাখতে চূণের ব্যবহার অপরিহার্য। বস্তুত চূণই মাটির পদার্থগত ও রাসায়নিক অবস্থার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে মাটিকে সক্রিয় করে তোলে জলের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির কাজে নিরলস প্রয়াস চালাতে।

এই থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। জল অপরিহার্য হলেও মাছচাষের অনুকূল জলের গুণাগুণের বেশীর ভাগটিই পুকুরের তলদেশের মাটির দ্বারা আরোপিত। মাটি জটিল পদার্থ থেকে পুষ্টিকর মৌলিক পদার্থগুলিকে শৃঙ্খলমুক্ত করে জলে সঞ্চারিত করে, জল সকলকে তাই বিতরণ করে তাদের খাদ্য, পুষ্টি জোগায়। মাটি দাতা, জল গ্রহীতা ; মাটির বলেই জল বলীয়ান। তাই মাটির গুণাগুণেরই প্রতিফলন, প্রতিচ্ছবি দেখা যায় জলে। এই বিচার-বিশ্লেষণে মাছচাষের পুকুরে জলের পরিচর্যা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ তলদেশের মাটির পরিচর্যা। উর্বর, সবল মাটি দুর্বল জলকেও উৎপাদিকা শক্তি জুগিয়ে প্রবল শক্তিশালী করে তুলতে পারে, কিন্তু মাটি অনুর্বর, নিষ্ক্রিয়, দুর্বল হলে পুকুরে মাছচাষ অনিবার্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জলের পর্যাপ্ত পরিচর্যা সত্ত্বেও।

মাটির এই কার্য-ক্ষমতা যে পুকুরের যত বেশী মাছচাষে সেই পুকুর তত বেশী উৎপাদক। এই কার্য-ক্ষমতার ভিত্তিতেই মাছচাষের পুকুরকে তাই মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(ক) উৎপাদক পুকুর : যে পুকুরে মাছ দ্রুত ও ভালভাবে বাড়ে। এইসব পুকুরের তলদেশের মাটি নরম ও কালো পলিমাটিযুক্ত। বালি ও কাঁকরের ভাগ অতি নগণ্য। প্রদত্ত সার ও জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং

তলদেশে বেশীদিন অপচা বা আধপচা অবস্থায় সঞ্চিত থাকে না।

(খ) **স্বল্প উৎপাদক পুকুর ঃ** মাছ বাড়লেও, বাড় প্রথম শ্রেণীর পুকুরের মত সন্তোষজনক নয়। এইসব পুকুরের তলদেশে নরম ও কালো পলিমাটির তুলনায় বালি ও কাঁকরের ভাগ বেশী। প্রদত্ত সার ও জৈব পদার্থের পচন প্রায়ই সম্পুর্ণ হয় না এবং অনেকটা অংশই আধপচা অবস্থায় তলদেশে সঞ্চিত থাকে।

(গ) **অনুৎপাদক পুকুর ঃ** মাছ মোটেই বাড়ে না। যে আকারে ছাড়া হয় পুকুরে প্রায় সেই আকারেই থেকে যায়। তলদেশের মাটি-বালি ও কাঁকরযুক্ত, শক্ত, নরম নয়। প্রদত্ত সারের প্রায় সবটাই অবিকৃত অবস্থায় তলদেশে পড়ে থাকে। জৈব পদার্থ প্রচুর পরিমাণে অপচা বা আধপচা অবস্থায় তলদেশে সঞ্চিত থাকে।

পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্য স্থিতিশীল বা অপরিবর্তনীয় নয়। অযত্নে বা অনভিজ্ঞ, অবৈজ্ঞানিক পরিচালন পদ্ধতির জন্য যেমন উৎপাদক পুকুরের ফলন ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে ঐ পুকুর কম উৎপাদক বা অনুৎপাদক পুকুরে পরিণত হতে পারে, তেমনই আবার কিছুটা পাঁক তুলে ফেলে পুকুর সংস্কার করা, অতিরিক্ত বালি ও কাঁকরযুক্ত শক্ত মাটির পুকুরে পরপর বেশ কিছুদিন ধরে কাঁচা গোবর, বিল-খালের পাঁকমাটি ব্যবহার করে পুকুরের তলদেশে জলধারণ ক্ষমতা-যোগ্য নরম, কালো পলিমাটি সৃষ্টি করা, নিয়মিতভাবে পুকুরে চূণ ও সার প্রয়োগ করা, মাছকে কৃত্রিম পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো, ইত্যাদি আধুনিক মাছচাষ পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা ও দক্ষ পরিচালনায় কম উৎপাদক ও অনুৎপাদক পুকুরকেও উৎপাদক পুকুরের পর্যায়ে উন্নতি করে মাছের ফলন সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি করা যায়।

মাছচাষের পুকুরে চূণের ব্যবহার অপরিহার্য এই কথা মেনে

নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রশ্নটি অতি স্বাভাবিকভাবে মনে জাগে সেটি হলো, দেয় চূণের মাত্রা কি হবে। এর উত্তরে বলা যায় যে মাটির বা জলের পি.এইচ-এর মান (অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের নির্দেশক) এর ওপরই চূণের পরিমাণ নির্ভর করে। মাটির পি. এইচ জানতে হলে রসায়নাগারের সাহায্য চাই ; জলের পি এইচ পুকুর পাড়েই দেখে নেওয়া যায় এবং সাধারণভাবে এর ওপর নির্ভর করে কাজ করা চলে।

কলকাতায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিক্রির দোকানে পি. এইচ পেপার (কাগজ) কিনতে পাওয়া যায়। একটি ছোট গোলাকার প্লাস্টিকের খাপের মধ্যে রোল করা অবস্থায় এই কাগজ থাকে, টানলেই কিছুটা অংশ খাপের বাইরে বেরিয়ে আসে। খাপের ওপর দিকের ঢাকনায় কয়েকটি খোপ বা ঘর কাটা থাকে। প্রতিটি খোপের রং বিভিন্ন। প্রতিটি খোপের গায়ে একটি সংখ্যাও লেখা থাকে। কাঁচের গ্লাসে বা অন্য কোন পাত্রে পুকুরের কিছুটা জল নিয়ে অল্প এক টুকরো পি. এইচ কাগজ খাপ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ঐ জলে ডুবালে কাগজে একটা বিশেষ রং ফুটে ওঠে। বিভিন্ন খোপের বিভিন্ন রং-এর সঙ্গে মিলিয়ে যে খোপের রং কাগজের রং-এর সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায় সেই খোপের গায়ে লেখা নির্দিষ্ট সংখ্যাটিই পরীক্ষিত জলের পি. এইচ-এর মান।

৭·০ এর নীচে পি. এইচ-এর মান জলের অম্লত্ব নির্দেশ করে, মাটির ক্ষেত্রে এই মান ৬·৬। ৭·০ এর বেশী মান জলের ক্ষারত্ব নির্দেশ করে। অম্ল মাটি ও জলে মাছচাষে সুফল পাওয়া যায় না, সার প্রয়োগেও উপকার হয় না। মাছের খাদ্য খাওয়ার আগ্রহ থাকে না। মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হয় এবং পরিশেষে দুর্বল হয়ে মারা যায়। পি এইচ-মান ৪·০-এর কম হলে সেই জলে মাছ কোন-ভাবেই বাঁচতে পারে না। জলের পি. এইচ-এর মান যে পুকুরে ৭·৫—৮·৬ এর মধ্যে থাকে সেই পুকুরে মাছ চাষ ভাল হয়। মাটির পি. এইচ ৬·৮—৭·৫ এর মধ্যে থাকলেই ভাল হয়।

পি. এইচ-এর মানে অম্লত্ব প্রকাশ পেলে চূণ প্রয়োগ করে মাটি ও জলকে ক্ষারকীয় অবস্থায় নিয়ে আসতে হয়, অর্থাৎ পি. এইচ-এর মান বাড়িয়ে নিতে হয়। আবার, পি. এইচ-এর মান খুব বেশী হলে (৯·৫ এর উর্ধ্বে) বড় মাছের বিশেষ অসুবিধা না হলেও ছোট চারামাছের পক্ষে এই জল ক্ষতিকারক। এই জলের অতিরিক্ত ক্ষারজনিত ক্রিয়ায় চারামাছের গায়ের আঁশ খসে পড়ে, মাছ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। জলে ফেরাস সালফেট কিংবা এ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে জলের ক্ষারত্বের মাত্রা কমানো যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মাছচাষীর পক্ষে এইসব রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করা ও সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব এবং এই ব্যাপারে সামান্য ভুলেও পুকুরের মাছের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই, বাস্তবক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তে অল্প পরিমাণে (বিঘা প্রতি ৪০ কেজি) টাটকা কাঁচা গোবর জলে গুলে ও কাপড়ে ছেঁকে খুব পাতলা অবস্থায় কিছুটা পুকুরে ছড়িয়ে দিলে জলের ক্ষারত্ব সাময়িকভাবে হ্রাস পায়। বাড়তি সুবিধা হিসাবে গোবর সারের কাজ করে এবং মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীর কাজে সাহায্য করে। এইভাবে প্রতি সপ্তাহে একবার জলের পি· এইচ দেখে নেওয়া উচিত, যাতে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে মাছচাষের অনুকূল জলের সর্বোত্তম পি. এইচ-এর মান (৭·৫—৮·৬) পুকুরে বজায় রাখা যায়।

স্বাভাবিক কারণেই পি. এইচ-এর মান যত কম, চূণের পরিমাণ হবে তত বেশী। একই নিয়মে পি. এইচ-এর মান যত বেশী, চূণের পরিমাণ হবে তত কম। আবার, এ কথাও ঠিক যে একই পুকুরের ক্ষেত্রে সব সময় এবং বিভিন্ন পুকুরের ক্ষেত্রে একই সময়ে জল বা মাটির পি. এইচ-এর মান কখনওই এক হতে পারে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন নির্দিষ্ট সময়কালে কোন্ পুকুরে কতটা পরিমাণে চূণ ব্যবহারের প্রয়োজন তা জানতে হলে সেই সময়ে ঐ পুকুরের মাটির বা পাঁকের পি. এইচ-এর মান জেনে নিতে হবে।

মাটি বা পাঁকের অম্লত্বের পরিমাণ অনুযায়ী চূণের প্রয়োজন হয় এইরকম ঃ

পি. এইচ-এর মান	বিঘা প্রতি চূণের পরিমাণ (কেজি)
৪.০ এর কমে	২৫০—৫০০
৪.০—৪.৫	২০০—৪০০
৪.৫—৫.০	১৫০—৩০০
৫.০—৫.৫	১২৫—২০০
৫.৫—৬.০	৭৫ —১২৫
৬.০—৬.৫	৬০ —৭৫

আমাদের দেশে অধিকাংশ পুকুরেরই মাটি ক্ষারভাবাপন্ন হওয়ায় খুব সীমিত ক্ষেত্রেই ওপরের তালিকায় নির্দেশিত পরিমাণে চূণ ব্যবহারে প্রয়োজন হয়। এছাড়া মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য রাসায়নাগারের সাহায্যও সব সময় পাওয়া যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে তাই জলের পি. এইচ-এর মান অনুযায়ীই পুকুরে চূণ প্রয়োগ করতে হয়। মাছ ছাড়ার আগে পুকুর তৈরীর জন্ম প্রাথমিক অবস্থায় বিঘা প্রতি সাধারণত ৩০—৪০ কেজি চূণ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় জলের পি. এইচ-এর মান সর্বোত্তম পর্যায়ে (৭.৫—৮.৬) স্থিতিকরণের জন্য। পরবর্তীকালেও পুকুরে মাঝে মাঝে সার প্রয়োগের অন্তত ৩-৪ দিন আগে প্রতিবারই (স্বাভাবিক ব্যবধান একমাসে) চূণ ব্যবহার করতে হয় বিঘা প্রতি ৬—৮ কেজি হিসাবে। পুকুরে গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক, শামুক বেশী মাত্রায় জন্মালে বুঝতে হবে পুকুরে ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটেছে, কারণ, এদের দেহের প্রধান অংশই হল ক্যালসিয়াম যা এরা পুকুরের উপাদান থেকেই সংগ্রহ করে। স্বভাবতই এই জাতীয় পুকুরে কিছুটা বেশী মাত্রায় চূণ ব্যবহার করা দরকার। সার প্রয়োগের ব্যবধান বেশী হলেও চূণের মাত্রা বেশী হওয়া দরকার। সুযোগ-সুবিধার অভাবে জলের পি. এইচ অনুযায়ীই কাজ করা হলেও বছরে অন্তত ২-৩ বার পুকুরের মাটির নমুনা রাসায়নাগারে পাঠিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে

মাটির বিভিন্ন রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কীয় তথ্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয় চূণেরও সঠিক পরিমাণ জেনে নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিত। এ-বিষয়ে কল্যাণী রেলওয়ে ষ্টেশনের অদূরে কুলিয়ায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ মৎস্য-চাষ গবেষণা কেন্দ্রের সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

মাছচাষে চূণের ব্যবহার যেমন অপরিহার্য, তেমনি আবার প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশী পরিমাণে পুকুরে এর ব্যবহার মাছ-চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। এইরকম প্রতিকূল অবস্থায় ফসফরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি পুষ্টিকর মৌলিক পদার্থগুলির সুলভ অবস্থায় জলে অবস্থান ও জলে সঞ্চারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে খাদ্য-চক্রের প্রথম সোপান উদ্ভিজ খাদ্যাণুর সৃষ্টি তথা সমগ্র খাদ্য-চক্রের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে দিয়েছে অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য। আবার সেই সঙ্গে সৃষ্টিও করে চলেছে সমস্যার পাহাড়। পরিবেশ-দূষণ মানুষের অদূরদর্শিতাজনিত সৃষ্ট এইরকমই একটি সমস্যা যা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে ভয়াবহ আকারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মাছচাষে পুকুর থেকে বাড়তি সুযোগ আদায় করে অধিক থেকে অধিকতর ফলনের আশায় সার প্রয়োগ ও কৃত্রিম খাদ্য যোগানের মাত্রা দিন দিন যত বাড়তে থাকবে পুকুরের পরিবেশের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হওয়ার আশংকাও তত বৃদ্ধি পাবে। বস্তুত নিবিড় মাছচাষ প্রকল্পে মাছের বাড়তি মল ও আবর্জনার দ্রুত অপসারণ, পরিবেশের অমূল্য সম্পদ মৌলিক রাসায়নিক পদার্থগুলির আবর্তন, তলদেশে সঞ্চিত জৈব পদার্থের দ্রুত বিভাজন ও পচন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদত্ত সার ও খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য জলে উপযুক্ত পরিমাণে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সংরক্ষণ, ইত্যাদি সমস্যাগুলির কিছু কিছু লক্ষণ ইতিমধ্যেই, ছোট আকারে হলেও, প্রকাশ পাচ্ছে। এইসব সমস্যার দেশোপযোগী বাস্তবসম্মত সমাধানের পথ ও উপায় খুঁজে বার করা সেই সম্বন্ধে

মাছচাষীদের অবহিত করার কাজে মৎস্য-বিজ্ঞানীদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের চিন্তা-ভাবনা করারও যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে হয়।

সারাংশ

পুকুরের পরিবেশ বলতে মোটামুটিভাবে পুকুরের পাড়, জল ও মাটিকে বোঝায়।

মাছ জলে বাস করে, বাঁচবার জন্য জল থেকেই অক্সিজেন ও খাদ্য সংগ্রহ করে, জলেই বাড়ে, আবার ঐ জল দূষিত হলে জলেই মরে অকালে। তাই মাছচাষের কাজে জলের পরিচর্যা করা জলের পদার্থগত ও রাসায়নিক অবস্থা জানবার, বুঝবার মতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা অবশ্যই দরকার।

জলের পরিচর্যা বলতে বোঝায় জলের উৎপাদন ক্ষমতা বা উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যাতে পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে ও তাদের পুষ্টিসাধন ও বংশ-বৃদ্ধিতে জল প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে।

জলের এই উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি তথা খাদ্যাণুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধানত সূর্যের আলো, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও প্রয়োজন হয় জলের কয়েকটি পদার্থগত ও রাসায়নিক বিশেষ অবস্থা ও গুণাগুণ।

জল প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর মৌলিক রাসায়নিক পদার্থগুলি পায় পুকুরের তলদেশের মাটির কাছ থেকে। মাটিতে বসবাস-কারী কিছু জীবাণু ও বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা মাটি তলদেশে সঞ্চিত জৈব পদার্থ ও প্রদত্ত জটিল সারকে সরল পদার্থে রূপান্তরিত করে সেইসব পুষ্টিকর মৌলিক পদার্থগুলিকে জলে সঞ্চারিত করে। বস্তুত মাটির গুণাগুণেরই প্রতিফলন দেখা যায় জলে। মাছচাষে তাই পুকুরের তলদেশের মাটির ভূমিকা ও মাটির পরিচর্যাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মাটির কার্য-ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখার জন্য পুকুরে মাঝে মাঝেই চূণ প্রয়োগ করা অপরিহার্য। চূণ কবিরাজি ওষুধের অনুপান। অনুপান ছাড়া ওষুধ কাজ করে না, চূণ ছাড়া সারের কাজ হয় না। রান্নার কাজে নুন, মাছচাষে চূণ।

পুকুরে দেয় চূণের পরিমাণ নির্ভর করে জল ও মাটির পি. এইচ-এর মানের ওপর। পি. এইচ জল ও মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব নির্দেশ করে। পি. এইচ-এর মান যত কম, চূণের পরিমাণ তত বেশী, মান যত বেশী, চূণ তত কম। জলের পি. এইচ-এর মান ৭·৫—৮·৬ এর মধ্যে এবং মাটির ৬·৮—৭৫ এর মধ্যে থাকলে সেই পুকুরে মাছচাষ ভাল হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মাছ ছাড়ার আগে পুকুর তৈরীর কাজে জলের পি এইচ-এর সর্বোত্তম মান স্থিতিকরণের জন্য বিঘা প্রতি সাধারণত ৩০-৪০ কেজি চূণ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মাঝে মাঝে সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন পূর্বে প্রতিবার বিঘা প্রতি ৬-৮ কেজি পরিমাণ চূণ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। সুযোগ-সুবিধার অভাবে কেবলমাত্র জলের পি. এইচ অনুযায়ীই কাজ করা হলেও বছরে অন্তত ২-৩ বার পুকুরের মাটির নমুনা রসায়নাগারে পাঠিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাটির বিভিন্ন রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পর্কীয় তথ্যের প্রয়োজনীয় চূণেরও সঠিক পরিমাণ জেনে নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছচাষের উপযুক্ত পরিবেশ গঠনের অপর একটি মূলবান ও অপরিহার্য উপাদান। দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা লিটার প্রতি ৪-৫ মিলিগ্রাম থাকলে মাছের ফলন ভাল হয়। অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে মাছ সংকটে পড়ে জলের ওপর ভেসে ওঠে এবং ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মারাও যায়। বাঁশ বা লাঠি দিয়ে জলের বিভিন্ন জায়গায় ঘনঘন ঘা দিয়ে, বিঘা প্রতি ২৫০-৫০০ গ্রাম পটাশ পারম্যাঙ্গানেট জলে গুলে পুকুরে ছড়িয়ে দিলে জলে অক্সিজেনের

মাত্রা অল্প সময়ের মধ্যে বেড়ে যায় এবং মাছ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে জলের নীচের দিকে চলে যায়।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অভাবে ভুগছেন। মাছ থেকে আমরা সহজপাচ্য, অতি মূল্যবান প্রাণিজ প্রোটিন ও বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন পেয়ে থাকি। তাই প্রোটিনের অভাব পূরণের জন্য মাছের উৎপাদন বিপুলভাবে বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া শুধু বাস্তব-সম্মতই নয়, জরুরী প্রয়োজনও বটে। স্বভাবতই এই প্রোটিন-যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার হবে সার ও মাছের কৃত্রিম খাদ্যের পর্যাপ্ত ব্যবহার। তবে, সেই সঙ্গে পুকুরের সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় মৌলিক ব্যবস্থা-গুলিও সুনিশ্চিত করা দরকার; অন্যথায় মাছচাষের পরিবেশের ভারসাম্য বিপর্যস্ত এবং পরিবেশের সম্পদের আবর্তন গুরুতর-ভাবে বিঘ্নিত হওয়ার ফলে আমরা এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বো যে যুদ্ধে আমরা কোনদিনই জিততে পারব না।

পুকুরে সার প্রয়োগ--প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী

মাছচাষের পুকুরে সার দিতে হয়, এই ধারণা, মাত্র ছু-তিন দশক আগেও, আমাদের দেশের মাছচাষীদের ছিল না বললেই চলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এখন অবশ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে মাছের ফলন বৃদ্ধির জন্য যে-সব পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী বলে পরিগণিত, সার প্রয়োগ তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দরকার পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি। মাছের খাদ্য-চক্রে প্রথম ও মূল সোপান হল ফাইটোপ্ল্যাংকটন বা উদ্ভিজ খাদ্যাণু। এই উদ্ভিজ খাদ্যাণুই সমগ্র খাদ্য-চক্রে গতি সঞ্চার করে। পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মূল উদ্দেশ্যই হল এই উদ্ভিজ খাদ্যাণুর উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুকুরে সার প্রয়োগের মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বহু সংখ্যক পুকুরের মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে অধিকাংশ পুকুরেই মাছচাষের পক্ষে অপরিহার্য উপাদানগুলি, বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের প্রচণ্ড ঘাটতি আছে। এর কারণও আছে। মাছের খাদ্য-চক্র ও মাছের বৃদ্ধি মুখ্যত পুকুরে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের যোগানের ওপর নির্ভরশীল, যদিও তাপমাত্রা, পি-এইচ ইত্যাদিও এই চক্র ও মাছকে কিছুটা প্রভাবিত করে। স্বভাবতই মাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুকুরে এই ছুটি উপাদানেরই ঘাটতি বেশী করে দেখা দেয়। পুকুরের ভেতর থেকে এই ঘাটতি পূরণ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ, বেশীর ভাগ পুকুরই তৈরী করা হয় অনুর্বর জমিতে, বাড়ি তৈরীর সময় মাটি অথবা ইঁট তৈরীর প্রয়োজনে এবং যে-সব জমি কৃষিকার্যে অনুপোযুক্ত বলে গণ্য। এর ফলে পুকুরের তলদেশের মাটিতে উর্বরকের, বিশেষ করে ফসফরাসের সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই সীমিত

অবস্থায় থাকে এবং জলে উর্বরকের যোগান কম হয়। এই অবস্থায় উল্লিখিত উপাদান দুটির ঘাটতি পূরণ এবং পুকুরে এদের যোগান তথা মাছের খাদ্য-চক্রের গতি অব্যাহত রাখতে হলে পুকুরে নিয়মিত-ভাবে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসঘটিত সার প্রয়োগ করা অপরিহার্য।

জৈব ও অজৈব, উভয় প্রকারেরই সার পুকুরে ব্যবহার করা যায়। তবে, কী ধরনের চাষ করা হবে তার ওপর ভিত্তি করেই সার নির্বাচন করতে হয়। মিশ্র মাছচাষ পদ্ধতি অনুযায়ী পুকুরে জৈব সারের সঙ্গে রাসায়নিক সারও ব্যবহার করতে হয়; কিন্তু ডিমপোনা চাষের পুকুরে রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন ধরনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত জৈব সারের মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী বলে পরিচিত সেগুলি হল, কাঁচা গোবর, মহুয়া খোল ও সরষের খোল। অজৈব সার হিসাবে সাধারণত ব্যবহার করা হয় অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া ও সুপারফসফেট।

জৈব সার ব্যবহারে পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবে জু-প্ল্যাংকটন বা প্রাণিজ খাদ্য প্রাধান্য দেখা যায়। কিছু কিছু জৈব সার আবার সরাসরি প্রাণিজ খাদ্যাণুর খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয় এবং এর ফলে এইসব সার প্রাণিজ খাদ্যাণুর উৎপাদনে ও উৎপাদ-নের গতি বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। শৈশব অবস্থায়, অর্থাৎ, ডিমপোনা ও চারাপোনা চাষকালীন অবস্থায় প্রায় সব প্রজাতির মাছই খাদ্যের জন্য জু-প্ল্যাংকটনের ওপর নির্ভরশীল। এমন কী বড় অবস্থাতেও চাষোপযোগী আমাদের দেশীয় মাছের মধ্যে কাতলা কেবলমাত্র এই জু-প্ল্যাংকটন বা প্রাণিজ খাদ্যাণু খেয়ে বেঁচে থাকে ও বড় হয়। রুই মাছ আধপচা উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণিজ ও উদ্ভিজ উভয়-প্রকার খাদ্যাণুই খায়। মৃগেল মাছ পুকুরের তলদেশের জলজ কীটাণু ও পচা, আধপচা জৈব পদার্থের সঙ্গে প্রাণিজ ও উদ্ভিজ উভয়প্রকার খাদ্যাণুই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। পুকুরে চাষ করা হয় এমন সব মাছের মধ্যে একমাত্র সিলভার কার্প মাছই খাদ্যের জন্য ফাইটো-

প্ল্যাংকটন বা উদ্ভিজ খাদ্যাণুর ওপর নির্ভরশীল, যদিও প্রয়োজনে তারাও যে প্রাণিজ খাদ্যাণু গ্রহণ করে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবে প্রাণিজ খাদ্যাণুর গুরুত্ব এবং পুকুরে এর উৎপাদন এবং প্রাধান্য বজায় রাখতে জৈব সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এই থেকে বোঝা যায়।

নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম ছাড়াও মাছচাষের পুকুরে অন্যান্য যে-সব রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে সেগুলি হল লোহা, তামা ম্যাংগানিজ, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি। এইসব উপাদানের প্রয়োজনের মাত্রা অবশ্য এত কম যে পরীক্ষাগারে মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তার পরিমাপ করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবুও এদের অভাবে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন যে ব্যাহত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোন একটি বা দুটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক সার থেকে এতগুলি উপাদান পাওয়া যায় না। যেমন, অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া থেকে পাওয়া যায় নাইট্রোজেন, সুপারফসফেট থেকে প্রধানত ফসফরাস। কেবলমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করে মাছচাষ করার ব্যাপারে এটি একটি বড় বাধা। পক্ষান্তরে প্রায় প্রতিটি উপাদান কিছু না কিছু পরিমাণে পাওয়া যায় যে-কোন জৈব সার থেকে। তাছাড়া তলদেশের মাটির সরসতা বজায় রাখতে এবং মাটিতে অবস্থিত জীবাণুর অস্তিত্ব ও কার্যক্ষমতা সুনিশ্চিত ও অব্যাহত রাখার জন্যেও জৈব সারের ব্যবহার অপরিহার্য, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে জৈব সারের সঙ্গে কোন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক সার ব্যবহারে অধিক সুফল পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে বড় মাছচাষের পুকুরে (মিশ্র মাছচাষ পদ্ধতি ছাড়া সাধারণভাবে চাষে) বিঘা প্রতি জলকরে প্রতিমাসে ৫ কেজি পরিমাণ সুপারফসফেট ব্যবহার করা হলে মাছের ফলন নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পায়।

পুকুরে নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ করে মাছের ফলন নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করা সম্ভব হলেও এরও একটি সীমা আছে। রাসায়নিক সীমা

ও খাদ্য-চক্র সম্পর্কীয় সীমা ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমা হল অর্থনৈতিক সীমা। এই সীমা হল, পুকুরে প্রয়োগ করা সারের মূল্য এবং ঐ সার ব্যবহার করার ফলে প্রাপ্ত বাড়তি মাছের মূল্য যখন সমান বা কাছাকাছি হয়ে যায়। পরিমাণের দিক থেকে জৈব সারের তুলনায় রাসায়নিক সার অনেক কম লাগে, রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির তারতম্যে (গোবরে নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ১.৯ ভাগ, ইউরিয়া ৪৬ ভাগ)। প্রচলিত জৈব সারের মধ্যে আবার একমাত্র গোবর ছাড়া সরষের ও মহুয়া খোলের দাম মোটেই কম নয়। তাছাড়া কৃষিকাজে ও জ্বালানী হিসাবে গোবরের ব্যবহার দিন দিন যেভাবে বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে শহরাঞ্চলে তো বটেই, গ্রামঞ্চলেও গোবর দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ার যথেষ্ট আশংকা আছে। অতি বাস্তব এই পরিপ্রেক্ষিতে জৈব সারের ওপর চাপ কিছুটা কমিয়ে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বর্তমানের তুলনায় কিছুটা বাড়াতে পারলে সার প্রয়োগের অর্থনৈতিক সীমা থেকে নিঃসন্দেহে অনেকটা দূরে থাকা সম্ভব হবে। তাছাড়া এর ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পেয়ে মাছচাষে লাভের পরিমাণ বেশী হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভবনা আছে।

রাসায়নিক সারের প্রচলন বাড়াতে হলে এখনও বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। জলহাওয়া, তাপমাত্রা ও বিভিন্ন অঞ্চলের পুকুরের মাটির গুণাগুণ অনুযায়ী কোন্ ধরনের চাষে কোন্ বিশেষ সার কতটা পরিমাণে দিতে হবে, সারের সর্বোত্তম মাত্রা এবং বিভিন্ন কিস্তিতে প্রয়োগকালের মধ্যে সময়ের কতটা ব্যবধান রাখতে হবে, ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে মাছচাষীদের প্রকৃতপক্ষে কোন সঠিক ধারণা নেই। সরকারী গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এইসব বিষয়ের সঠিক মান স্থির করা এবং সেই সম্বন্ধে মাছচাষীদের অবহিত করার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে হয়; কারণ, বেহিসাবী রাসায়নিক সার ব্যবহারে মাছচাষের পুকুরে উপকারের বদলে অপকার হওয়ার

আশংকাই বেশী।

যে জাতীয় সারই ব্যবহার করা হোক না কেন লক্ষ্য রাখতে হয় যেন সারের যথোপযুক্ত ও সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হয়। মাছ ছাড়ার আগে পুকুর তৈরীর জন্য গোবর, সরষের খোল বা মহুয়া খোল জলের ওপর সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে দিলেই চলে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায় এইসব সার ব্যবহার করতে হয় কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে। গোবর জলে গুলে যতটা সম্ভব পাতলা অবস্থায় ছড়িয়ে দিতে হয় এবং একদিনে সবটা না দিয়ে সমান কিস্তিতে ২-৩ দিনে ব্যবহার করাই সঙ্গত। সরষের খোল রাতে জলে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে বেশী জলে মিশিয়ে নিয়ে পাতলা অবস্থায় জলে ছড়িয়ে দিতে হয়। মহুয়া খোল ব্যবহারের অবশ্য প্রশ্ন ওঠে না, কারণ, প্রথম অবস্থায় এর বিষক্রিয়া থাকায় একমাত্র মাছ ছাড়ার আগে এই খোল ব্যবহার করা যায়। প্রচলিত রাসায়নিক সারের মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট জলে গুলে ছড়িয়ে দেওয়া চলে। ইউরিয়া জলে না গুলে সরাসরি পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হয়। সুপারফসফেট জলে গুলে তরল অবস্থায় পুকুরে ছড়িয়ে দেওয়া বিধেয়। এতে অদ্রবণীয় ফসফেট হিসাবে তলানি পড়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় এবং সারের সর্বোত্তম ব্যবহারও হয়।

পরিশেষে এই প্রসঙ্গে প্রত্যেক মাছচাষীর এই কথাটি সবসময় মনে রাখা দরকার যে পুকুর থেকে মাছ তুলে যখনই বাজারে পঠানো হয় তখন যা বিক্রি করা হয় তা দৃশ্যতঃ মাছ ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিক্রি করে দেওয়া হয় পুকুরের অমূল্য সম্পদ নাইট্রোজেন, ফসফ-রাস, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি উপাদানগুলি যারা তিলে তিলে নিজেদের নিঃশেষ করে মাছকে খাদ্য, পুষ্টি জুগিয়ে তাদের কলেবর বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে। মাছ বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে এই সব মূল্যবান অপরিহার্য উপাদানগুলিও পুকুর থেকে বিদায় নেয়। অথচ এরা না থাকলে মাছচাষ হবে না ; মাছ বাঁচবার জন্য, বাড়-বার জন্য খাদ্য, পুষ্টি পাবে না। তাই অনিবার্য কারণেই পুকুরে

নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ করে পুকুরে এইসব অপরিহার্য উপাদানের যোগান অব্যাহত রাখা একান্ত দরকার যাতে কোন সময় পুকুরে এদের ঘাটতি দেখা না দেয়।

সারাংশ

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দরকার পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি। আবার, এই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্যই হল মাছের খাদ্য-চক্রে প্রথম ও মূল সোপান উদ্ভিজ খাদ্যাণুর উৎপাদন বৃদ্ধি যা সমগ্র খাদ্য-চক্রে গতি সঞ্চার করে। পুকুরে নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

পুকুরে জৈব বা অজৈব উভয় প্রকার সারই ব্যবহার করা যায়। কী ধরনের চাষ করা হবে তার বিচারেই সার নির্বাচন করার দরকার হয়। প্রচলিত জৈব সারের মধ্যে গোবর, সরষের খোল ও মহুয়া খোলই প্রধান। রাসায়নিক সারের মধ্যে সাধারণত ব্যবহার করা হয় এ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া ও সুপারফসফেট।

মাছচাষে জৈব সার ব্যবহারের অপরিহার্যতা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে অন্য কারণ ছাড়াও কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই আমাদের দেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বর্তমানের তুলনায় আরও বেশী পরিমাণে হওয়া দরকার। এতে উৎপাদন ব্যয় কমবে, মাছচাষে লাভের অঙ্ক বাড়বে।

চেক কেটে দিনের পর দিন কেবল টাকা তুলে গেলে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বেশীদিন চালু থাকে না ; চালু রাখতে হলে মাঝে মাঝে টাকা জমাও দিতে হয়। মাছচাষের পুকুরও তো এক ধরনের ব্যাংক। এই ব্যাংক থেকে মাছ তুলে বিক্রি করা মানেই নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম জাতীয় টাকা তুলে নেওয়া। আর, এই টাকা তুলে নিয়ে যদি কিছু কিছু

আবার জমা না পড়ে তাহলে পুকুরের অ্যাকাউন্টও বেশীদিন চালু রাখা যায় না। মাছের উৎপাদন কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাই পুকুরে নিয়মিতভাবে সার দিয়ে পুকুরের সম্পদ বাড়িয়ে যেতে হয় যাতে সেই সম্পদ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে মাছচাষীর প্রকৃত সম্পদ বাড়াতে পারে।

মাছকে কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো

আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষের বিভিন্ন পদ্ধতিতে সর্বাধুনিক সংযোজন হল বাইরে থেকে যোগান দিয়ে মাছকে সরাসরি পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো। উদ্দেশ্য, মাছের বাড় দ্রুততর করা, চাষের জন্য পুকুরে চারামাছ মজুত করার সংখ্যা বা পরিমাণ বাড়ানো এবং সর্বশেষে প্রতি ইউনিট এলাকায় (বিঘা/হেক্টর প্রতি) মাছের উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা।

সার প্রয়োগের ফলে পুকুরে সৃষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের দ্রুত বৃদ্ধির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। কীভাবে এই প্রাকৃতিক খাদ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যায় এবং উৎপাদনের গতি চাষকালীন সম্পূর্ণ সময়ের জন্যই বা কীভাবে বজায় রাখা যায় সে সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে, কারণ বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছু কিছু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সীমা-নির্দেশকারী কারণের জন্য সার প্রয়োগের মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়েও জলে উর্বরকের ঘনত্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। মাছের দ্রুত বৃদ্ধি তথা মাছের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির জন্য তাই আজকাল সব দেশেই মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিপূরক হিসাবে নানা রকমের পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্যের যোগান দেওয়া হয় পুকুরে।

বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন ধরনের হলেও একটি বিষয়ে অধিকাংশ প্রজাতির মাছের মধ্যে বিশেষ মিল দেখা যায়। পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্যের প্রতি এদের আসক্তি প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই প্রবল। সরষে বা বাদাম খোলের গুঁড়ো পুকুরে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুকুরের প্রায় সব মাছকেই দেখা যায় ছোটাছুটি করতে। শুরু হয়ে যায় রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কে আগে পৌঁছতে পারে খাবারের কাছে। কৃত্রিম খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্ন

প্রজাতির মাছের মধ্যে লক্ষ্যণীয় এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করেই সম্ভবত মাছের পরিপূরক খাদ্যসংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা গড়ে উঠেছে।

মাছের কৃত্রিম খাদ্য হিসাবে উদ্ভিদজাত ও প্রাণিজাত বিভিন্ন রকমের বস্তুর ব্যবহার বিভিন্ন দেশে প্রচলির আছে। তবে আমাদের দেশে এর ব্যবহার খুব বেশীদিন আগের নয়। প্রচলিত প্রাণিজাত খাদ্যের মধ্যে প্রধান প্রধান বস্তুগুলি হল, ফিসমিল (মাছের গুঁড়ো), রেশম কীটের পিউপা, পশুর (ভেড়া, ছাগল) নাড়ীভূঁড়ি, কসাই-খানার ছাট্ মাংস, রক্ত ইত্যাদি। উদ্ভিদজাত খাদ্যের মধ্যে বিশেষ-ভাবে ব্যবহৃত হয় সরষের খোল, বাদাম খোল, সয়াবীন চূর্ণ, চালের কুঁড়ো, গমের ভূষি, জলে ভেজা বা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মানুষের খাওয়ার অযোগ্য চাল, ডাল, গম ইত্যাদি।

মাছের কৃত্রিম খাদ্য নির্বাচনে যে বিষয়গুলি বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হয় সেগুলি হল :

(১) খাদ্যবস্তুটি সহজে, স্থানীয়ভাবে জোগাড় করা সম্ভব কী না এবং এটি সস্তা দামের কী না ;

(২) খাদ্যবস্তুটি গ্রহণ করার ব্যাপারে মাছের যথেষ্ট আগ্রহ ও আসক্তি আছে কী না ;

(৩) খাদ্যবস্তুটি মাছের বৃদ্ধিতে কতটুকু সাহায্য করে,

(৪) খাদ্যবস্তুটি ব্যবহারে খাদ্য-মাছ রূপান্তরে পড়তা থাকে কী না ; অর্থাৎ খাদ্যবস্তুটি ব্যবহারে মাছের যে বাড়তি উৎ-পাদন পাওয়া যায় তা বিক্রি করে খাদ্য বাবদ খরচের অতিরিক্ত কিছু অর্থলাভ হয় কী না।

এছাড়াও মাছের সাইজ বা আকার ও বয়স বিবেচনা করেও খাদ্য নির্বাচন করার দরকার হয়। গ্রাস কার্প মাছের আদর্শ প্রিয় খাদ্য হল কাঁটা ঝাঁঝি। কিন্তু ছোট অবস্থায় (৫″-৬″ ইঞ্চি সাইজ হওয়ার আগে) এরা এই ঝাঁঝি খেতে পারে না। তাই এই অবস্থায় এদের খেতে দিতে হয় খুব ছোট আকারের পানা, যেমন স্কুজি পানা

বা পোস্ত পানা। একটু বড় হলে কাঁটা ঝাঁঝি কুচিয়ে ছোট আকারে দেওয়া যেতে পারে এবং আরও একটু বড় হলে গোটা ঝাঁঝিই খেতে দেওয়া যায়।

প্রাণিজাত খাদ্যের মধ্যে ফিসমিল, রেশম কীটের পিউপা আমাদের দেশে মোটেই সহজলভ্য নয়, স্বল্পমূল্যের তো নয়ই। কসাইখানার নানারকম আবর্জনা সংগ্রহ করা সর্বত্র সহজ নয়। এইসব কারণে আমাদের দেশে মাছের কৃত্রিম খাদ্য হিসাবে প্রাণি-জাত খাদ্যের ব্যবহার এখনও বিশেষ প্রচলিত হয়নি।

উদ্ভিদজাত খাদ্যের মধ্যে সহজলভ্যতা ও স্বল্পমূল্যের বিচারে আমাদের দেশের পুকুরে সাধারণত চালের কুঁড়ো ও সরষে বা বাদাম খোল ব্যবহার করা হয়। আমাদের নিজেদের খাদ্যে যেমন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ছাড়াও ভাত, রুটি জাতীয় কিছু ভারী খাবারের প্রয়োজন হয়, মাছকেও সেইভাবে প্রোটিন-সমৃদ্ধ কোন খোল জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে চালের কুঁড়ো খাওয়ানো হয়। এতে উৎপাদন-ব্যয়ও অনেকটা কমে। বাদাম খোলের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী, তাই সরষের খোলের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত।

বিভিন্ন ধরনের চাষে বিভিন্ন মাত্রায় কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহার করার দরকার হয়। ডিমপোনার চাষে সাধারণত ১৫ দিনের খাদ্যসূচী তৈরী করা হয়, কারণ এই সময়ের মধ্যেই উৎপন্ন ধানিপোনা বিক্রি করে দেওয়া হয় অথবা বড় করার জন্য আঁতুড় পুকুর থেকে তুলে নিয়ে চারাপোনা তৈরীর পুকুরে ছাড়া হয়। প্রথম ৫ দিন ডিমপোনার দেহের ওজনের (১ লক্ষ ডিমপোনার ওজন ১৪০ গ্রাম) ৩-৪ গুণ, পরের ৫ দিন ৫-৬ গুণ এবং তারপরে ৮-১০ গুণ হিসাবে খাদ্য দিতে হয়। পুকুরে সৃষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য অথবা স্বল্পতা অনু-সারে দেয় পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্যের পরিমাণ কম বা বেশী করা দরকার। চারাপোনার চাষে মাছের দেহের ওজনের শতকরা ৪-৫ ভাগ হিসাবে এবং মজুত পুকুরে বা মিশ্র মাছচাষের পুকুরে শতকরা ২-৪ ভাগ হিসাবে খাদ্য ব্যবহার করতে হয়। বিভিন্ন

ক্ষেত্রে দেয় এই খাদ্যের মোট পরিমাণ কীভাবে নির্ধারণ করতে হয় সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'মাছচাষে অঙ্ক' শীর্ষক অধ্যায়ে।

হিসাব অনুযায়ী দৈনিক যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয় চালের কুঁড়ো ও সরষের খোল একসঙ্গে মিশিয়ে সেই পরিমাণ খাদ্য তৈরী করে নিতে হয়। কুঁড়ো ও খোলের পরিমাণ হবে সমান সমান (ওজনে)। খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং পুকুরের সব-স্তরের মাছের মধ্যে খাদ্যের সুষম বণ্টনের স্বার্থে বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী পুকুরে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হলে বাঞ্ছিত সুফল পাওয়া যায়।

সরষের খোলের অর্ধেক পরিমাণ অংশ গুঁড়ো করে নিয়ে চালের কুঁড়োর অর্ধেক পরিমাণ অংশের সঙ্গে মেশানো হয়। প্রয়োজন মনে করলে পাতলা কাপড়ের ওপর ফেলে মিশ্রিত খাদ্যবস্তু থেকে মিহি অংশটা চেলে নিয়ে পৃথক করে নেওয়া হয়। চেলে নেওয়ার পর কাপড়ে আটকে-থাকা মিশ্রিত খাদ্যবস্তুর সঙ্গে কুঁড়ো ও খোলের অবশিষ্ট অর্ধেক অংশ মিশিয়ে নিয়ে অল্প পরিমাণ জল দিয়ে মেখে ছোট ছোট মণ্ড তৈরী করা হয়। এইভাবে মোট পরিমাণের খাদ্য-বস্তুকে মোটামুটি সমান দুভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। একটি ভাগ থাকে শুকনো অবস্থায় (চেলে নেওয়া মিহি অংশ) এবং অপর ভাগটি জলে মাখা অবস্থায় মণ্ডাকারে।

এইবার পুকুরপাড় থেকে কিছুটা দূরে নির্দিষ্ট ২-৩ জায়গায় (৩-৪ হাত অন্তর) পূর্বে বর্ণিত উভয় প্রকার খাদ্যই (শুকনো ও মণ্ডাকারে) অল্প অল্প পরিমাণে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে জলের ওপর ছড়িয়ে দিতে হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার, খাদ্যের কোন অংশ বাতাসে উড়ে জলের বাইরে পড়ে অপচয় না হয়। শুকনো মিশ্রিত খাদ্যবস্তু মিহি ও হালকা হওয়ার জন্য জলের ওপরে অনেকক্ষণ ভেসে থাকতে পারে। এর ফলে জলের ওপরের ও মাঝের স্তরের মাছের পক্ষে এই খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা ও সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করা সম্ভব হয়। কিন্তু নীচের স্তরের মাছের পক্ষে এই শুকনো খাদ্যবস্তু থেকে তাদের

প্রয়োজনীয় প্রাপ্য অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তারা যেটুকু অংশ পেতে পারে তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। মণ্ডাকারে যে খাদ্যবস্তু ছড়িয়ে দেওয়া হয় ভিজে এবং স্বভাবতই কিছুটা ভারী হওয়ার জন্য দ্রুত জলের নীচের দিকে চলে যায় এবং এই খাদ্যবস্তু থেকে মাঝের স্তরের মাছ (রুই) কিছু অংশ পেলেও বেশীর ভাগ অংশটিই পায় নীচের স্তরের মাছ, মৃগেল, আমেরিকান রুই ও মাগুর।

এইভাবে সকালের দিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য দেওয়া হলে দেখা যাবে যে পুকুরের প্রায় সব মাছই ঐ সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ভিড় করছে। সময়সূচী ও পদ্ধতি ঠিকভাবে মেনে চললে সব স্তরের মাছের মধ্যে প্রদত্ত খাদ্যের সুষম বণ্টন ও সম্পূর্ণ খাদ্যের সদ্ব্যবহার বহুলাংশে সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ সত্ত্বেও অন্তত প্রতি সাতদিন অন্তর একবার খাদ্য দেওয়ার নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির তলাকার মাটি নাড়াচাড়া করে দেওয়া দরকার। মাঝে মাঝে ঐ সব অঞ্চলে অল্প পরিমাণে চূর্ণজল ছড়িয়ে দেওয়াও দরকার পুকুরের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে।

কারও কারও মতে পুকুরের একটি মাত্র নির্দিষ্ট জায়গায় খাদ্যবস্তুটি ছড়িয়ে দিলে খাদ্যের সদ্ব্যবহার আরও ভালভাবে হয়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে এইরকম ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ও সবল মাছের অধিক তৎপরতার ফলে কিছুটা ছোট আকারের ও দুর্বল প্রকৃতির মাছ খাদ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির মাছের নিজেদের মধ্যেও তৎপরতার তারতম্যে একটিমাত্র নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে সকলের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

চালের কুঁড়োর পরিবর্তে গমের ভূষি অথবা অর্ধেক পরিমাণ কুঁড়ো ও অর্ধেক পরিমাণ গমের ভূষি সরষের খোলের সঙ্গে ব্যবহার করলে খরচ কিছুটা বাড়লেও মাছের বৃদ্ধির হার দ্রুততর হয়। এবং এর ফলে মাছচাষে লাভের পরিমাণও বেশী হয়।

দিনের বরাদ্দ খাদ্য একবারে ব্যবহার না করে তিন ঘন্টার ব্যবধানে দুবারে ৬০ : ৪০ অনুপাতে দেওয়া হলে পুষ্টি ও সদ্ব্যবহারের দিক থেকে অধিক সুফল পাওয়া যায়। তবে বেশী বেলায় রোদের তাপে ওপরের স্তরের জলের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পুকুরে খাদ্য দেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে যে পুকুরে ডিমপোনা ও চারাপোনার চাষ করা হয়। অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে এমন দিনেও খাদ্য দেওয়া চলে না। ধানিপোনা ও চারাপোনা বিক্রি করার দিন বাইরে থেকে পুকুরে খাদ্য দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত। এতে পরিবহনকালে মাছ মরার আশংকা অনেক কমে যায়। পুকুরের জলের রং গাঢ় সবুজ মতো দেখা গেলে খাদ্যের পরিমাণ কমাতে হয়, প্রয়োজনে খাদ্য দেওয়া বন্ধ করতে হয় যতদিন না জলের অবস্থা স্বাভাবিক হয়। শীতকালে (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি) খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে অর্ধেক বা সিকি পরিমাণ করলেও ক্ষতি হয় না, কারণ শীতে চলাফেরা কমে যাওয়ার ফলে খাদ্যের প্রতি মাছের আসক্তিও কমে যায়।

উৎপাদন-ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে অন্যান্য ধরনের নতুন নতুন স্বল্প-মূল্যের খাদ্যের কথা চিন্তা করা দরকার। আটা-ময়দা কলের, ডাল-ভাঙ্গা কলের বাড়তি-পড়তি আবর্জনা এফ. সি. আই গোডাউনের পরিত্যক্ত চাল, গমের অংশ বিশেষ সস্তা দামে কিনতে পাওয়া গেলে ঐ সব বস্তুকে কিছুটা ঝাড়াই-বাছাই করে নিয়ে মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাঁউরুটি-বিস্কুটের কারখানার পরিত্যক্ত খাদ্যবস্তুও কাজে লাগানো যায়। মাছের প্রাক-প্রজনন পরিচর্যার কর্মসূচিতে মাছকে নিয়মিতভাবে প্রোটিনসমৃদ্ধ কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেখা গেছে চালের কুঁড়ো বা গমের ভুষি ও সরষে বা বাদাম খোলের সঙ্গে মুসুর ডালের গুঁড়ো (মোট খাদ্যের শতকরা ২০ ভাগ) মিশিয়ে খাওয়ালে মাছের গোনাডের যথোপযুক্ত পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটে এবং মাছ দ্রুত পরিণত পরিপক্কতা লাভ করে প্রজননক্ষম হয়। কিছুটা পরিমাণে রান্না

করা চালের খুদের সঙ্গে সরষের খোল বা বাদাম খোল মিশিয়ে মাছকে নিয়মিতভাবে খাওয়ালেও মাছ দ্রুত প্রজননক্ষম হয়।

জলের তাপমাত্রার সঙ্গে মাছের খাদ্য গ্রহণের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাপমাত্রা বাড়লে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বাড়ে, তাপমাত্রা কমলে মাছ খাদ্য কম খায়। আমাদের দেশে শীত কম, থাকেও অল্প ৩-৪ মাস। বছরের অধিকাংশ সময়েই জলের তাপমাত্রা থাকে মোটামুটি উষ্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক কারণেই আমাদের দেশে মাছকে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে। বস্তুত মাছচাষে উন্নতশীল চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে মাছকে দৈনিক ১০-১২ বারও কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো হয়। আমাদের দেশের জলহাওয়া অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও আমরা এই বিষয়ে যে বিশেষ অগ্রসর হতে পারিনি তার প্রধান কারণ, ঐ সব উন্নতশীল দেশের মতো মাছচাষের আধুনিক পরিবেশমূলক মূল কাঠামোটি আমরা আজও গড়ে তুলতে পারিনি। কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবহার যত বাড়বে মাছের বাড়তি মল অপসারণের এবং জলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সংরক্ষণের সমস্যাও তত বেশী করে দেখা দেবে। বস্তুতপক্ষে মাছের বাড়তি মল ও আবর্জনা পুকুরে ব্যবহৃত কৃত্রিম খাদ্যেরই একপ্রকার উপজাত পদার্থ। পুকুরে পর্যাপ্ত জলের ও জলস্রোতের ব্যবস্থা এবং পুকুরের মধ্যেই আরও দক্ষতার সঙ্গে মল ও আবর্জনা দ্রুত হ্রাস ও নষ্ট করা যায় এইরকম পরিবেশমূলক বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সম্ভব। আর, এর ফলে আমাদের দেশে পুকুরে বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহার এবং অভাবনীয় মাছের ফলন পাওয়া সম্ভব হবে।

আমাদের দেশের জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে কৃষিজমির ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা প্রতিকূল অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতায় গ্রামাঞ্চলে বেশী সংখ্যায় নতুন বড় জলাশয় খনন ও সৃষ্টির আশা করা যায় না। এই

পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হলে বর্তমান সমস্ত জলাশয়ের যেমন সদ্ব্যবহার দরকার মাছ-চাষের কাজে তেমনই দরকার প্রতি ইউনিট এলাকায় (বিঘা / হেক্টর) ফলনের হার বৃদ্ধির চেষ্টা করা। বস্তুতপক্ষে দেশের জলকরের আয়তন যখন প্রায় স্থির তখন দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করাই যে অধিক বাস্তবসম্মত সে-বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না ; এবং তা সম্ভব হতে পারে একমাত্র প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিপূরক হিসাবে মাছকে পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্য সর্বোচ্চ পরিমাণে খাওয়ানোর উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা কাজে লাগিয়ে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্য নিজগুণে মাছের দ্রুত বৃদ্ধি-লাভে সহায়তা করা ছাড়াও পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের সদ্ব্যবহারেও সাহায্য করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, বাইরে থেকে দেওয়া কৃত্রিম খাদ্য পুকুরে সৃষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিপূরক এই কথা বলা অপেক্ষা প্রাকৃতিক খাদ্য ও কৃত্রিম খাদ্য পরস্পর পরস্পরের যথার্থ পরিপূরক এই কথা বলাই অধিক সংগত বলে মনে হয়।

সারাংশ

মাছের বৃদ্ধি দ্রুততর করা, পুকুরে মাছ মজুত করার সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ানো এবং পরিশেষে প্রতি ইউনিট এলাকায় মাছের ফলনের হার বৃদ্ধির জন্য পুকুরে সৃষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিপূরক হিসাবে মাছকে আজকাল নানা ধরনের পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো হয়। মাছচাষে উন্নত চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এই সব কৃত্রিম খাদ্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশের জলহাওয়ায় পুকুরে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহারের অবকাশ আছে। তবে সেই সঙ্গে পরিবেশমূলক যে-সব সমস্যা এই প্রযুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের সুষ্ঠু সমাধান করাও একান্ত দরকার। অধিক পরিমাণ খাদ্যের ব্যবহারে মাছের যে বাড়তি

মল ও আবর্জনা পুকুরে সঞ্চিত হবে তার দ্রুত অপসারণ বা পুকুরের মধ্যেই দ্রুত হ্রাস করার কথাও চিন্তা করতে হবে। জলে সর্বোত্তম পরিমাণে অক্সিজেনের সংরক্ষণের ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করার দরকার।

সহজলভ্যতা, স্বল্পমূল্য, খাদ্যের প্রতি মাছের আসক্তি এবং খাদ্য-মাছ রূপান্তরে পড়তা, বিশেষ করে' এই বিষয়গুলি বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হয় মাছের কৃত্রিম খাদ্য নির্বাচনে। আমাদের দেশে প্রধানত চালের কুঁড়ো, গমের ভূষি, সরষের খোল ও বাদাম খোল ব্যবহার করা হয় মাছকে সরাসরি খাওয়ানোর জন্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে নতুন নতুন অল্পমূল্যের অথচ মাছের পক্ষে পুষ্টিকর বিকল্প কৃত্রিম খাদ্যের উদ্ভাবন করার তাগিদে।

জনসংখ্যা প্রচণ্ড হারে বেড়ে চলেছে, সেই সঙ্গে মৎস্যভোজীর সংখ্যাও। জলাজায়গা বাড়ছে না অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা প্রতিকূল অবস্থায় ও প্রতিবন্ধকতায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাছের উৎপাদন বাড়াতে হলে প্রতি ইউনিট এলাকায় ফলনের হার বৃদ্ধি করা ছাড়া বিকল্প পন্থা নেই। আর, তা সম্ভব করতে হলে মাছকে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানোর উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে।

আঁতুড় পুকুর পরিচালনা

নদী ও বাঁধ থেকে কিংবা প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে ২-৩ দিন বয়সের যে অতি ক্ষুদ্র আকারের (৫-৭ মিলিমিটার) মাছের বাচ্চা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ডিমপোনা। এই ডিমপোনা দিয়েই মাছচাষের শুরু। ডিমপোনা সরাসরি বড় আকারের মজুত পুকুর বা পালন পুকুরে ছাড়া হয় না, ছাড়া উচিতও নয়; ছাড়লে ঐ সব বাচ্চা মাছ অকালেই মারা যায়। তাই এদের ছাড়া হয় নানা প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে তৈরী করা অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের অগভীর পুকুরে। অতি সঙ্গত কারণেই এই জাতীয় পুকুরকে বলা হয় আঁতুড় পুকুর।

জন্মের পর আঁতুড় ঘরে মানবশিশুকে যেমন অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে লালন-পালন করতে হয়. আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনা চাষের সময়ও ঠিক সেইভাবে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় এইসব শিশু মাছের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পরিচর্যার বিষয়ে। আঁতুড়ে শিশুকে খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় তার মায়ের ওপর। একই-ভাবে ডিমপোনাকেও নির্ভর করতে হয় আঁতুড় পুকুরের সৃষ্ট প্রাণিজ খাদ্যাণুর ওপর। বস্তুত শিশু তার মায়ের ওপর যতটা নির্ভরশীল, ডিমপোনা তার চেয়েও বেশী নির্ভরশীল এই খাদ্যাণুর ওপর; কেননা ধাত্রীর সাহায্য নিয়েও শিশুর প্রাণরক্ষা করা যায়, কিন্তু মাছের জীবন-চক্রের এই অতি শৈশব অবস্থায় ডিমপোনার বাঁচা ও বাড়বার জন্য খাদ্য হিসাবে প্রয়োজনীয় প্রাণিজ খাদ্যাণুর কোন বিকল্প নেই। আর, এই বিচারে যথার্থভাবেই বলা যায় যে আঁতুড় পুকুর ডিম-পোনাকে তার একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিয়ে তার প্রাণরক্ষা করে প্রকৃত ধাত্রীর কাজ করে, কেননা জন্মের পর থেকেই চাষোপযোগী রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছের ডিমপোনা তাদের

মায়ের কাছ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ডিমপোনা চাষে তথা মাছচাষে আঁতুড় পুকুরের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

কিন্তু খাদ্যই তো সব নয়, সমভাবে প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। অন্যথায়, শিশু যেমন আঁতুড়ে রোগাক্রান্ত হয়ে দুর্বল, জরাগ্রস্ত দেহের অধিকারী হয়ে নিজের ও সমাজের কোনো কল্যাণেই আসতে পারে না এবং বহুক্ষেত্রেই স্বল্পায়ু হয়, শিশুমাছ বা ডিম-পোনাও তেমনই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আঁতুড় পুকুরেই অকালে বিনষ্ট হয়। তাই আঁতুড় পুকুরে একদিকে যেমন ডিমপোনার আদর্শ খাদ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়ে তোলার দরকার, তেমনি দরকার পুকুরকে সর্বপ্রকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখা। স্বাভাবিক কারণেই এই উভয়বিধ কাজে সাফল্য লাভ নির্ভর করে আঁতুড় পুকুর পরিচালনার দক্ষতার ওপর। আঁতুড় পুকুর পরিচালনার কাজকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা –(১) পুকুর তৈরী করা ; (২) পুকুরে ডিমপোনা ছাড়া ; (৩) পরিপূরক খাদ্যের যোগান দেওয়া ও (৪) ফসল তোলা।

(১) **পুকুর তৈরী** ঃ ডিমপোনা চাষের জন্য ছোট ও মাঝারি আয়-তনের (৫ কাঠা থেকে এক বিঘা) আয়তকার, অগভীর (৩-৩॥ ফুট) পুকুরই উপযুক্ত। এই ধরনের পুকুরের মধ্যে যেগুলি আবার ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শুকিয়ে যায় সেগুলিকে আদর্শ আঁতুড় পুকুর বলা যায়। শুকিয়ে যাওয়ার ফলে তলদেশের মাটি সূর্যের কিরণ পেয়ে বিশোধিত হয়। মাটি বায়বীয় অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে, জৈব পদার্থ সমূহের খনিজ উপাদানে রূপান্তরণের গতি দ্রুততর হয়। খনিজ নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মাটির অম্লত্ব হ্রাস পায়, মাটির উর্বরতা তথা পুকুরের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। পুকুর তৈরী করা বলতে বোঝায় (ক) জলের ও পাড়ের যাবতীয় আগাছা পরিষ্কার ; (খ) পুকুরের শোল, শাল, ল্যাটা, চিতল, বোয়াল ইত্যাদি যাবতীয় মৎস্যভূক মাছ এবং চাঁদা, চেলা, দাঁড়কে, কুচো চিংড়ি ইত্যাদি আমাছা ও চুনো মাছ নির্মূল করা ; (গ) পুকুরের চূণ ও সার

প্রয়োগ ও (ঘ) পুকুরের ক্ষতিকর পোকামাকড় ধ্বংস করা।

আগাছা পরিষ্কার : মাছচাষে অগ্রগতির ফলে আজকাল আর বর্ষাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না পুকুরে ডিমপোনা ছাড়ার জন্য। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন বাঁধে ও প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই রুই, কাতলা, মৃগেল এবং এমন-কি সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প মাছেরও ডিমপোনা পাওয়া যায়, নদীতে যেখানে পাওয়া যায় জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বা আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুকুর তৈরীর কাজেও হাত দেওয়া দরকার আগের তুলনায় অনেক আগে। এতে একটি বাড়তি সুযোগও পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসের প্রথমেই যদি পুকুরে ডিমপোনা ছাড়া যায় তাহলে আশ্বিন মাসের মধ্যেই প্রয়োজনমত চারাপোনা বিক্রি করার পরও খাওয়ার মাছ হিসাবে কিছু পরিমাণ মাছ বিক্রি করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে উৎপাদন বাড়বে, উৎপাদন-ব্যয় কমবে এবং স্বভাবতই মাছচাষে অধিক লাভবান হওয়া যাবে।

মাছচাষের এই বাড়তি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হলে চৈত্র মাসের শুরুতেই পুকুরের জলের যাবতীয় উদ্ভিদ, আগাছা তুলে ফেলে পুকুরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখতে হবে। এইসব উদ্ভিদ, আগাছা শুধু যে পুকুরে প্রয়োগ করা সারে ভাগ বসিয়ে নিজেদের কলেবর বৃদ্ধি করে ডিমপোনার প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি ঘটায় তাই না, ডিমপোনা ও ছোটো চারাপোনার চলাফেরায় এবং পুকুরে জাল টানার কাজেও বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে শিশু-মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পুকুর থেকে চারাপোনা তোলার কাজও ব্যাহত হয়। জলজ উদ্ভিদ ও আগাছা নির্মূল করার সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের চার পাড়ের যাবতীয় জঙ্গলও পরিষ্কার করা দরকার। এই-সব ঝোপঝাড়, জঙ্গলে সাপ, ব্যাঙ ও নানা জাতের পোকামাকড় আশ্রয় নেয় এবং এরা সকলেই ডিমপোনার ঘোরতর শত্রু।

জলশূন্য শুকনো আঁতুড় পুকুরের ক্ষেত্রে জলজ উদ্ভিদ বা আগাছার সমস্যা থাকে না ঠিকই, কিন্তু পাড়ের যাবতীর জঙ্গল

অবশ্যই পরিষ্কার করা দরকার। এইসব শুকনো পুকুরের তলদেশের মাটিতে লাঙ্গল দিয়ে কিছুদিন ফেলে রাখতে পারলে প্রভূত উপকার হয়। এর দ্বারা পুকুরের 'বার্ধক্যের ভার' হ্রাস পায় এবং পুকুরের জলের ওপর তলদেশের মাটির প্রভাব বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ পুকুরের উৎপাদিকা-শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। লাঙ্গল দেওয়ার পর এবং হাতে প্রয়োজনীয় সময় থাকলে চাষ দেওয়া মাটিতে ধন্‌চের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রায় ২৫-৩০ দিনের মধ্যে চারা-গাছগুলির ১২-১৫ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হয়ে উঠলে মাটিতে আর একবার লাঙ্গল দিয়ে চারাগাছগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। বৃষ্টির জল পাওয়া না গেলে এই সময় বাইরে থেকে পুকুরে কিছুটা জল দেওয়া দরকার যাতে ধন্‌চের চারাগাছগুলি শুকিয়ে না যায় এবং ভালভাবে পচতে পারে। এরপর পুকুরে প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃষ্টির জল জমলে চূণ ও সার প্রয়োগ করতে হয়। ধন্‌চের চারা পুকুরের মাটিকে নাইট্রোজেনে সমৃদ্ধ করে তোলে, যে নাইট্রোজেন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীর কর্মকাণ্ডে একটি অপরিহার্য ও প্রধান রাসায়নিক উপাদান হিসাবে গণ্য।

মৎস্যভুক মাছ ও আগাছা নির্মূল করাঃ যে সব পুকুরে সারা বছর জল থাকে সেখানে লাঙ্গল দেওয়া ও ধন্‌চের চাষ সম্ভব নয়। সুতরাং জলের ও পাড়ের আগাছা, উদ্ভিদ ও জঙ্গল পরিষ্কার করার পর-পরই পুকুরের মৎস্যভূক মাছ ও আগাছা নির্মূল করার কাজে হাত দিতে হয়। মৎস্যভূক মাছ ছাড়াও সাপ, ব্যাঙ ও পোকামাকড় সরাসরি ডিমপোনা ধ্বংস করে ; গেঁড়ি, গুগলি ইত্যাদি পুকুরের মাটির অন্যতম উপাদান ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটিয়ে ডিমপোনার সুসংহত বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায় এবং আগাছা ও পুকুরের অন্যান্য মাছও পুকুরে সৃষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্যের ভাগ বসিয়ে পরোক্ষভাবে ডিমপোনার ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে।

অবাঞ্ছিত এইসব মৎস্যভূক মাছ, আগাছা, পোকামাকড় ইত্যাদি আঁতুড় পুকুর থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য পুকুরে মহুয়া

খোল প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি বিঘা জলকরে প্রতি এক ফুট গভীর (গড়) জলের জন্য ১০০ কেজি পরিমাণ মহুয়া খোল ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। মহুয়া খোল পুকুরের জলে সব জায়গায় সমভাবে ছড়িয়ে দিতে হয়। এক থেকে দুঘণ্টার মধ্যেই পুকুরের যাবতীয় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী জলের ওপর ভেসে ওঠে ও ছট্‌ফট্ করে মারা যায়। এই অবস্থায় জাল টেনে এদের সহজেই ধরেও নেওয়া যায়। এই মাছ খাওয়াও যায়, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোন ক্ষতি হয় না।

মহুয়া খোল গুঁড়ো ও চটি দুভাবেই বাজারে বিক্রি হয়। গুঁড়ো খোল নেওয়ার সুবিধা এই যে এটি সম্পূর্ণভাবে এবং তাড়াতাড়ি জলে গুলে যায়। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে গুঁড়ো খোলেই ভেজাল দেওয়া সহজ এবং ভেজাল চলেও বেশী। পক্ষান্তরে চটি খোলে ভেজাল দেওয়া অনেক কঠিন কাজ এবং ভেজাল ধরাও সহজ। তবে বিশেষ করে চটি খোল ব্যবহার করা হলে ২-৩ দিন অন্তর পুকুরের তলদেশের মাটি ভালভাবে ঘেঁটে দেওয়া দরকার যাতে কোন চটিই অবিকৃত অবস্থায় থাকতে না পারে। ভাল মানের মহুয়া খোল নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগের ২-৩ দিনের মধ্যেই পুকুরের জলের রং লাল্‌চে বা ফিকে লাল্‌চে বা কাল্‌চে দেখায়। সাধারণক্ষেত্রে খোল ব্যবহারের ১৬-২১ দিনের মধ্যে পুকুর ডিমপোনা ছাড়ার উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। খোল ব্যবহারের পর পুকুরে সার হিসাবে গোবর দেওয়া হলে সময় লাগে প্রায় ৩০ দিন।

যে-সব পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পরে বৃষ্টির জলে ভর্তি হয় সেইসব পুকুরে মহুয়া খোল ব্যবহার করা অপরিহার্য নয়, কারণ স্পষ্টতই এই-সব পুকুরে কোন মাছ বা জলজ প্রাণী থাকতে পারে না। এই জাতীয় আঁতুড় পুকুরে বৃষ্টির জল জমার পর বিঘা প্রতি ৩০-৪০ কেজি কলিচুণ প্রয়োগ করে ৬-৭ দিন পরে সার হিসাবে বিঘা প্রতি ২০০০-২২০০ কেজি কাঁচা গোবর ব্যবহার করার দরকার হয়। তবে গোবরের পরিবর্তে এইসব পুকুরে মহুয়া খোলও ব্যবহার করা

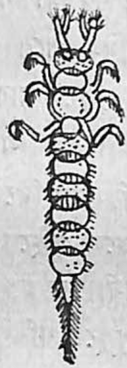
যায় অন্য আর একটি উদ্দেশ্যে। মহুয়া খোল বিষক্রিয়ায় পুকুরের মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীকে যেমন অল্প সময়ের মধ্যে মেরে ফেলে, তেমনি আবার পুকুরের জলে পচে অতি উত্তম সার হিসাবে কাজ করে। আর এই সারের ক্রিয়ায় পুকুরে ডিমপোনার অতি প্রিয় ও আদর্শ খাদ্য, প্রাণীকণা প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়। কাঁচা গোবর ব্যবহারেও পুকুরে প্রচুর পরিমাণে প্রাণীকণার সৃষ্টি হয়।

চূণ ও সার প্রয়োগ : মহুয়া খোল ব্যবহারের ৬-৭ দিন পর আঁতুড় পুকুরে চূণ প্রয়োগ করা দরকার। বিঘা প্রতি ৩০-৪০ কেজি কলিচূণ বাইরে কোন পাত্রে জলে গুলে পুকুরে সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হয়। চূণ দেওয়ার ৬-৭ দিন পরে পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হয়। কাঁচা গোবরই আঁতুড় পুকুরে ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে ভাল সার। মহুয়া খোল দিয়ে তৈরী করা আঁতুড় পুকুরে গোবর না দিলেও চলে ; দিলেও অল্প পরিমাণে দিতে হয়. বিঘা প্রতি ৩০০-৪০০ কেজি হিসাবে। এর ফলে পুকুরে প্রাণীকণার প্রাচুর্য ঘটে এবং পুকুরে এদের স্থিতিবাসও দীর্ঘায়িত হয়।

ডিমপোনা ছাড়ার দিন থেকেই আঁতুড় পুকুরে পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহার করা হলেও ৬-৭ দিন পর থেকেই ৩-৪ দিন অন্তর পুকুরে বিঘা প্রতি ১২-১৬ কেজি হিসাবে সরষের খোল ব্যবহার করা উচিত। খোল রাতে জলে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে বেশী পরিমাণ জলে গুলে নিয়ে খুব পাতলা অবস্থায় পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হয়। পুকুরে দেওয়া এই খোলজল সারের কাজ করে। খাদ্যাণু সৃষ্টির গতি-প্রকৃতি অব্যাহত থাকে। কোন সময় পুকুরে খাদ্যাণুর অভাব ঘটে না। এর ফলে পুকুরে প্রথম কিস্তিতে ছাড়া ডিমপোনা থেকে উৎপন্ন ধানিপোনা বা ছোট চারাপোনা তুলে নেওয়ার পর দ্বিতীয়বার এবং একইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তিতেও ডিমপোনা ছাড়ার আগে আঁতুড় পুকুরে নতুন করে সার দেওয়ার জরুরী প্রয়োজন হয় না। অবশ্য পুকুর থেকে মাছ তোলা ও নতুন করে ডিমপোনা ছাড়ার মধ্যে কয়েকদিন সময় পাওয়া গেলে অল্প পরিমাণে

চূণগোলা জল ও খুব পাতলা অবস্থায় এবং সম্ভব হলে ছেঁকে নেওয়া কাঁচা গোবরের জল পুকুরে ছড়িয়ে দেওয়া হলে ছোট মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরীর কাজ ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজ আরও ভালভাবে সম্পন্ন হয়।

(১) **পোকামাকড় মারা**ঃ কাঁচা গোবর, মহুয়া খোল ইত্যাদি ব্যবহার করার ফলে আঁতুড় পুকুরে গোবরা পোকা, কাঠিপোকা, হাঁসপোকা বা তাঁতপোকা প্রভৃতি নানা রকমের পোকামাকড়ের সৃষ্টি হয়।


গোবরা পোকা


কাঠিপোকা

পার্শ্ববর্তী পুকুর বা নীচু জলাজায়গা থেকেও এইসব পোকামাকড়ের আমদানী হয় সার দিয়ে তৈরী করা আঁতুড় পুকুরে। ডিমপোনার


হাঁসপোকা


জল ফড়িং

পক্ষে এইসব পোকামাকড় অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরীক্ষা করে দেখা গেছে

একটি মাত্র হাঁসপোকা মাত্র একঘণ্টা সময়ের মধ্যে এক হাজার ডিমপোনা ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। তাই ডিমপোনা ছাড়ার আগে আঁতুড় পুকুর থেকে এইসব পোকামাকড়কে অতি অবশ্যই নির্মূল করা দরকার। এইসব পোকামাকড় বাঁচবার জন্য অক্সিজেন সংগ্রহ করে সরাসরি বায়ুমণ্ডলের বাতাস থেকে। তাই দেখা যায়, প্রায় প্রতি মুহূর্তেই এরা জলের ওপরের স্তরে আসে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে। এদের ধ্বংস করার জন্য তাই জলের ওপরে এমন একটি আস্তরণের সৃষ্টি করা হয় যা ডিমপোনার পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, অথচ এইসব পোকামাকড়ের বাঁচার জন্যে জলের ওপরে আসার পথে দুর্ভেদ্য বাধার সৃষ্টি করে এদের মৃত্যু-ফাঁদের কাজ করে।

এই জাতীয় আস্তরণ তৈরী করা হয় সরষের তেল ও সাবানের মিশ্রণ দিয়ে অথবা শুধু কেরোসিন তেল ব্যবহার করে। বিঘা প্রতি ৭ কেজি পরিমাণ সরষের তেল ও ২ কেজি ৪০০ গ্রাম পরিমাণ কাপড়-কাচা সাবান দিয়ে মিশ্রণ তৈরী করা হয়। গরম জল ফুটিয়ে সাবান-জল তৈরী করে নিয়ে তার সঙ্গে সরসের তেল মেশানো হয় এবং এই মিশ্রণ পুকুরের জলের ওপরের স্তরে সব জায়গায় এমনভাবে ছড়ান হয় যাতে সম্পূর্ণ স্তরটা ঢেকে যায় এই মিশ্রণে এবং একটি পুরু আস্তরণের সৃষ্টি হয়। কেরোসিন তেল ব্যবহার করা হলে প্রয়োজন হয় বিঘা প্রতি ২৮ লিটার তেলের। সরষের তেল দুর্মূল্য হওয়ায় কেরোসিন তেলের ব্যবহারই (সাবান ছাড়া) বেশী প্রচলিত এবং এতে পোকামাকড় মারার কাজও সন্তোষজনকভাবেই হয়।

সরষের তেল—সাবানের মিশ্রণ অথবা শুধু কেরোসিন তেল যাই ব্যবহার করা হোক না কেন ব্যবহার করতে হয় আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনা ছাড়ার ১২-২৪ ঘন্টা আগে। বৃষ্টির মধ্যে বা জোরে বাতাস বইছে এইরকম সময়ে মিশ্রণ বা কেরোসিন তেল ব্যবহার করা চলে না। এতে মিশ্রণ বা কেরোসিন তেল পুকুরের একপাশে গিয়ে জমা হয়, জলের ওপরের স্তরের সব অংশ ঢাকা পড়ে না, ফাঁকা জায়গা থেকে পোকামাকড় অনায়াসেই অক্সিজেন সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতে পারে।

ডিমপোনা ছাড়ার পরেও আঁতুড় পুকুরে নতুন করে পোকামাকড়ের আবির্ভাব ঘটলে নিঃসঙ্কোচে পুনরায় একই মাত্রায় কেরোসিন তেল ব্যবহার করা যায়। কেবল লক্ষ্য রাখা দরকার, ব্যবহৃত কেরোসিন তেল যেন সরাসরি ডিমপোনার দেহের ওপর গিয়ে না পড়ে। ডিম-পোনা ঝাঁক বেঁধে বিভিন্ন দলে যখন জলের ওপরের স্তরে ঘুরে বেড়ায় সেই সময়ে কেরোসিন তেল ব্যবহার করা উচিত নয়। রৌদ্রোজ্জ্বল তুপুরবেলাই সবচেয়ে ভাল সময় এই অবস্থায় পুকুরে কেরোসিন তেল ব্যবহারের পক্ষে, কারণ, ওপরের স্তরের জল এই সময় ঈষৎ উষ্ণ হওয়ার ফলে ডিমপোনা আত্মরক্ষার তাগিদেই কিছুটা গভীর জলে চলাফেরা করে।

তেল-সাবানের মিশ্রণ কিংবা কেরোসিন তেল ব্যবহার করার আগে আঁতুড় পুকুরে চটজাল টেনে যতটা সম্ভব পোকামাকড় ধরে মেরে দিতে হয়। এতে বিশেষ করে বড় আকারের পোকামাকড়, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, সাপ ইত্যাদির বিনাশসাধন সহজ হয়। তবে, জাল একবার বা তুবারের বেশী টানা উচিত নয়, কারণ, অসাবধানবশত এতে পুকুরে সৃষ্ট খাদ্যাণুর বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

এই পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পরই আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনা ছাড়া যায়। কিন্তু তার আগে দেখে ও বুঝে নিতে হয় পুকুর তৈরীর মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কী না; অর্থাৎ পুকুরে ডিমপোনার খাদ্য প্রাণী-কণা প্রয়োজনীয় পরিমাণে সৃষ্টি হয়েছে কী না এবং জলের রাসায়নিক অবস্থা ডিমপোনা ছাড়ার অনুকূল কী না। কোনো অজ্ঞাত কারণে পুকুরের অবস্থা ডিমপোনা ছাড়ার পক্ষে উপযুক্তভাবে তৈরী হয়নি বলে মনে হলে আরও সময় দিতে হবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার জন্য। প্রয়োজনে নতুন করে চূণ, সার ব্যবহার করতে হবে এবং স্বভাবতই এইরকম অবস্থায় পুকুরের পোকামাকড় মারার কাজ স্থগিত রাখতে হবে।

জলের রাসায়নিক গুণাগুণ ও জীবতত্ত্বগত অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক-ভাবে জানতে হলে কোন পরীক্ষাগারে জলের নমুনা পাঠিয়ে পরীক্ষা

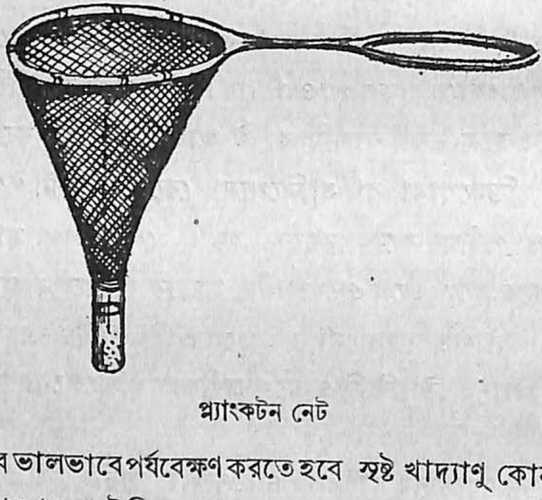
ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এটি প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। তাই, জলের পি. এইচ.-এর মান, দ্রবীভূত অক্সিজেনের উপস্থিতি, অবাঞ্ছিত গ্যাসের অনুপস্থিতি এবং পুকুরে সৃষ্ট ডিমপোনার প্রাকৃতিক খাদ্য-খাদ্যাণুর অস্তিত্ব, পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে মোটা-মুটিভাবে জেনে ও বুঝে নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ের কাজে অগ্রসর হওয়া যায়।

জলের পি. এইচ.-এর মান ৭'৫-৮'৬-এর মধ্যে পাওয়া গেলে ঐ জল ডিমপোনা চাষের উপযুক্ত বলে মনে করা যায়। পি. এইচ.-এর মান নির্ধারণের সহজ ও সরল পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'মাছচাষের পরিবেশ' শীর্ষক অধ্যায়ে। মান কম হলে অল্প পরিমাণ চূণ জলে গুলে পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হয়। ৪-৫ দিন পর আবার জল পরীক্ষা করে দেখতে হয় পি. এইচ-এর মান বেড়েছে কী না। জলে বুদ্‌বুদ্‌ দেখা দিলে বুঝতে হবে তলদেশের মাটিতে অবাঞ্ছিত গ্যাস সঞ্চিত আছে। এইরকম অবস্থাতেও অল্প পরিমাণে চূণ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অস্তিত্ব বুঝতে হলে একটি বালতি বা ঐ জাতীয় পাত্রে পুকুরের জল নিয়ে কিছু ডিমপোনা বা ধানিপোনা রেখে ২৪ ঘণ্টা পরে ছাড়া মাছের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে হয়। বেশীরভাগ মাছ বেঁচে থাকলে বুঝতে হবে, জলে প্রয়োজনীয় মাত্রায় অক্সিজেন আছে এবং জলে কোন অবাঞ্ছিত গ্যাস নেই। জলের পি. এইচ.-এর উপযুক্ত মান ও খাদ্যাণুর উপস্থিতিও জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অস্তিত্বের পরিচায়ক।

পুকুরে সৃষ্ট খাদ্যাণুর পরিমাণ ও গুণাগুণ যাচাই করে দেখতে হলে দরকার হয় 'প্ল্যাংক্টন নেট' নামে এক ধরনের হাতজালের। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিক্রির দোকানে 'নাইলো বোল্ট্' কাপড় দিয়ে তৈরী ও হাতল-সহ একটি গোল রিং-এ আটকানো মোচাকৃতির এই বিশেষ ধরনের হাতজাল কিনতে পাওয়া যায়। এনামেলের লিটার মগের সাহায্যে পুকুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিবারে এক লিটার

হিসাবে ২৫ লিটার জল এই জালের মধ্যে ঢেলে ছাঁকা হয়। জল পুকুরেই চলে যায়, আর খাদ্যাণু জালের শেষ প্রান্তে আটকানো কাঁচের টিউবে জমা হয়। ২৫ লিটার জল থেকে কমপক্ষে এক সি.সি. পরিমাণ খাদ্যাণু পাওয়া গেলে বুঝতে হবে পুকুরে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্যাণুর সৃষ্টি হয়েছে এবং ডিমপোনার প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব ঘটবে না।

'প্ল্যাংকটন নেট'-এর অভাবে গামছা বা মল্‌মল্‌ কাপড় পুকুরের জলের বেশ কয়েক জায়গায় টানলে জল পুকুরেই বেরিয়ে যাবে, খাদ্যাণু গামছা বা কাপড়ে আটকে যাবে। পুকুরের সব জায়গা থেকেই এইভাবে জল ছেঁকে কম-বেশী পরিমাণে খাদ্যাণু গামছা বা কাপড়ে পাওয়া গেলে বুঝতে হবে পুকুরে প্রয়োজনীয় খাদ্যাণু আছে। এই খাদ্যাণুর কিছুটা নমুনা জলসহ একটি কাঁচের প্লেটে বা থালায়



প্ল্যাংকটন নেট

নিয়ে খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে সৃষ্ট খাদ্যাণু কোন্‌ জাতের। উদ্ভিদ খাদ্যাণু বা উদ্ভিদকণার রং সবুজ, পক্ষান্তরে প্রাণিজ খাদ্যাণু বা প্রাণিকণার রং ধূসর বা ঘিয়ে বা রংবিহীন সাদা। প্রাণিকণা জলের মধ্যে ডুবে থেকে নড়াচড়া করে, উদ্ভিদকণা স্থির অবস্থায় জলে ভেসে থাকে। প্রাণিকণার প্রাচুর্যই ডিমপোনা ছাড়ার সপক্ষে সবুজ সংকেত এবং বিপরীতভাবে উদ্ভিদকণার প্রাচুর্য ডিমপোনা ছাড়ার

বিপক্ষে লাল সংকেত হিসাবে গণ্য।

(২) **পুকুরে ডিমপোনা ছাড়া :** বিভিন্ন পন্থায় আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনার চাষ করা যায়। ছাড়ার ৪ দিন পরেই কাপড়ের ঢালাই চটে সব ডিমপোনা তুলে নিয়ে অন্য আর একটি তৈরী আঁতুড় পুকুর বা লালনপুকুরে ছাড়া যেতেপারে। এই পুকুরে আরও ৩-৪ দিন রাখার পর উৎপন্ন ধানিপোনা বিক্রি করা যায়। দ্বিতীয় পন্থায় প্রথম পুকুরে ৭-৮ দিন রাখার পর তৈরী করা লালন বা চারাপোনা চাষের পুকুরে ডিমপোনা চালিয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে ২-৩ দিন পর থেকেই ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনা বিক্রি করা। অপর আর একটি পন্থা অনুযায়ী প্রথম পুকুরেই প্রায় ১২ দিন ডিমপোনা চাষ করে উৎপন্ন ছোট চারাপোনা বিক্রি করা এবং ১৫-১৬ দিন পরে (ডিমপোনা ছাড়ার দিন থেকে) অবশিষ্ট চারাপোনা লালন পুকুরে ছাড়া কিছুটা বড় আকারের চারাপোনা তৈরীর জন্য।

উপরে বর্ণিত পন্থাগুলির মধ্যে চাষের জন্য বিশেষ যে পন্থাটি বেছে নেওয়া হয় তার ওপরই নির্ভর করে আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনা ছাড়ার সংখ্যা বা পরিমাণ। তৃতীয় পন্থা অনুযায়ী একই পুকুরে ডিমপোনার চাষ করা হয় ১৫-১৬ দিনকাল ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনা তৈরী ও বিক্রির জন্য। স্বাভাবিক কারণেই এই পন্থায় চাষে আঁতুড় পুকুরে ছাড়া ডিমপোনার সংখ্যা অপর দুই পন্থায় চাষের তুলনায় কম হওয়া দরকার। সাধারণভাবে বলা যায় যে আঁতুড় পুকুরে জলের স্বাভাবিক ৩-৩॥ ফুট গভীরতায় তৃতীয় পন্থা অনুযায়ী চাষে বিঘা প্রতি জল করে ৩-৪ লক্ষ, দ্বিতীয় পন্থায় চাষে ৫-৬ লক্ষ ও প্রথম পন্থায় চাষে ৮-১০ লক্ষ ডিমপোনা ছাড়া যেতে পারে। অবশ্য পুকুরে সৃষ্ট প্রাণিকণার প্রাচুর্য বা স্বল্পতা অনুযায়ী ডিমপোনার সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যায়।

পুকুরপাড়ে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ডিমপোনা জলে ছাড়া উচিত নয়। ডিমপোনার পাত্রটি (সাধারণত অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি) আংশিকভাবে পুকুরের জলে ডুবিয়ে রেখে এবং পুকুরের জল অল্প অল্প

পরিমাণে পাত্রের জলের সঙ্গে মিশিয়ে পাত্রের ও পুকুরের জলের তাপমাত্রা মোটামুটি সমান হলে তবেই পুকুরে ডিমপোনা ছাড়তে হবে, তার আগে নয়। ডিমপোনা ছাড়তে হবে পাড় থেকে ২-৩ হাতের মধ্যে পুকুরের একাধিক অগভীর জায়গায় অল্প অল্প পরিমাণে, এতে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি থাকে কম।

(৩) **পরিপূরক খাদ্যের যোগান :** ডিমপোনা ছাড়ার দিন থেকেই ডিমপোনাকে সরাসরি খাওয়ানোর জন্য পরিপূরক খাদ্য হিসাবে পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্যের যোগান দেওয়া হয় আঁতুড় পুকুরে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'মাছকে কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো' এবং 'মাছচাষে অঙ্ক' শীর্ষক অধ্যায়ে।

(৪) **ফসল তোলা :** ডিমপোনার চাষে আঁতুড় পুকুরে ঘন ঘন জাল টানা একান্ত দরকার। বস্তুত এই প্রক্রিয়া ছোট মাছের পক্ষে টনিকের কাজ করে। ডিমপোনা ছাড়ার ৩-৪ দিন পর থেকে শুরু করে একদিন অন্তর পুকুরে ⅛ ইঞ্চি বা ¼ ইঞ্চি (অভাবে ১ ইঞ্চি) ফাঁসের টানাজাল দিতে হয় অন্তত ৩ দিন। এরপর একদিন অন্তর ঘন চটজাল টানতে হয় অন্তত ২ দিন। প্রতিবারই মাছকে বেশ কিছুক্ষণ জালে আটকে রেখে জলের ঢেউ দিতে হয় মাছকে ব্যায়াম করানোর জন্য। এতে মাছ শক্ত ও পরিবহনযোগ্য হয়ে ওঠে। তারপর যে-কোন দিন চটজাল টেনে উৎপন্ন ধানিপোনা বা ছোট চারাপোনা বিক্রি করা অথবা লালন পুকুরে ছাড়া যেতে পারে কিছুটা বড় আকারের চারাপোনা তৈরীর জন্য।

প্রথমবারের ফসল এইভাবে তুলে নেওয়ার পর দ্বিতীয়বার একই পুকুরে ডিমপোনা ছাড়া যায়। ডিমপোনা ছাড়ার আগে, হাতে সময় থাকলে, অল্প পরিমাণ (বিঘা প্রতি ৬-৮ কেজি) চূণ জলে গুলে পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হয়। ৩-৪ দিন পরে কিছুটা কাঁচা গোবর (বিঘা প্রতি ১৫০-২০০ কেজি) জলে গুলে, ছেঁকে পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হয়। ৬-৭ দিন পরেই পুকুরে জাল টেনে এবং

তারপর কেরোসিন তেল ছড়িয়ে পুকুরের পোকামাকড় ধ্বংস করে নিয়ে ডিমপোনা ছাড়তে হয়। একই পদ্ধতিতে একই মরশুমে তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তিতেও ঐ একই আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনার চাষ করা যায়। তবে, ডিমপোনা ছাড়ার সংখ্যা অবশ্যই প্রথমবারের তুলনায় কম করা দরকার। পুকুরের জলের গুণাগুণ ও উৎপাদিকা শক্তির পরিমাপ সাপেক্ষে সাধারণভাবে বলা যায় যে দ্বিতীয় কিস্তিতে প্রথম কিস্তিতে ছাড়া ডিমপোনার সংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তিতে যথাক্রমে শতকরা ৫০ ও ৪০ ভাগ ডিমপোনা ছাড়া যেতে পারে। এই হিসাব অনুযায়ী প্রথম কিস্তিতে ছাড়া ডিমপোনার শতকরা ৬০-৭০ ভাগ, দ্বিতীয় কিস্তির ৫০-৬০ ভাগ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তিতে ৪০-৫০ ভাগ ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনার উৎপাদন আশা করা যায়। রুই, কাতলা, মৃগেলের ডিমপোনার মতো আঁতুড় পুকুরে একই পদ্ধতিতে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কমন কার্পের ডিমপোনার চাষ করা যায়।

চতুর্থ কিস্তিতে ডিমপোনা চাষের পর উৎপন্ন অধিকাংশ ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনা বিক্রি অথবা লালন পুকুরে স্থানান্তরিত করে দিয়ে অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট চারাপোনা (বিঘা প্রতি ৩০-৪০ হাজার—২-৩ সেমি বা গড় ১ ইঞ্চি সাইজের) আঁতুড় পুকুরেই চাষ করে অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের (৬-৭.৫ সেমি বা মোটামুটি ২॥-৩ ইঞ্চি) চারাপোনা উৎপাদন করা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই চাষে উৎপন্ন বড় সাইজের চারাপোনার অধিকাংশ বিক্রি অথবা লালন / মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করার পর অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক চারাপোনা (২॥-৩ ইঞ্চি সাইজের বিঘা প্রতি ৩-৪ হাজার) আঁতুড় পুকুরেই চাষ করে বছরের শেষে রুই, কাতলা, মৃগেলের মার-মাছ বা খাওয়ার মাছ উৎপাদন ও বিক্রি করা যায় এবং এইভাবে ডিমপোনা চাষের পর বছরের অবশিষ্ট ৬-৬॥ মাস কাল সময়ের জন্য আঁতুড় পুকুরের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা যায়। অথবা বিকল্প চাষ হিসাবে, দ্বিতীয় পর্যায়ে চাষে উৎপন্ন বড় সাইজের চারাপোনা

(২॥-৩ ইঞ্চি) বিক্রি কিংবা অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করে দিয়ে আঁতুড় পুকুরে বছরের অবশিষ্ট সময়কালের জন্য (কম-বেশী ৫ মাস) মাগুর মাছের চাষ করে পূর্ব-বর্ণিত পদ্ধতিতে চাষের (খাওয়ার মাছ উৎপাদন —সাধারণত রুই, কাতলা, মৃগেল) তুলনায় অধিক লাভবান হওয়া যায়।

সারাংশ

কৃষিকাজে যেমন বীজতলা, মাছচাষের কাজেও তেমনি আঁতুড় পুকুর। বীজতলার মতোই আঁতুড় পুকুর পরিচালনার দক্ষতার ওপর নির্ভর করে সারা বছরের মাছচাষে লাভ-লোকসান।

ডিমপোনা (৩-৪ দিন বয়সের বাচ্চা বা শিশুমাছ) চাষের জন্য ছোট ও মাঝারি আয়তনের (৫ কাঠা থেকে এক বিঘা) আয়তকার, অগভীর (৩-৩॥ ফুট) পুকুরই উপযুক্ত। জন্মের পরপরই শিশুমাছকে এই জাতীয় পুকুরে রেখে খাদ্য, যত্ন ও পরিচর্যা দ্বারা তাদের প্রাণরক্ষা করা এবং সর্বশেষে বড় মাছে পরিণত করার জন্য লালন ও পালন পুকুরে চাষের উপযোগী করে তৈরী করা হয়। তাই সঙ্গত কারণেই মহুয়া খোল, চূণ, গোবর, সার ইত্যাদি দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী করা এই জাতীয় পুকুরকে আঁতুড় পুকুর বলা হয়। আঁতুড় পুকুর শিশুমাছ ডিমপোনার খাদ্য উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে এবং সেই খাদ্যের যোগান দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ডিমপোনার ধাত্রীর কাজ করে। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে ডিমপোনার আঁতুড় ঘর বলতে তো আঁতুড় পুকুরকেই বোঝায়। তাই ডিমপোনার চাষে তথা মাছ-চাষের সমগ্র কর্মকাণ্ডে আঁতুড় পুকুরের গুরুত্ব অপরিসীম। আঁতুড় পুকুর পরিচালনার কাজকে মোটমুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) পুকুর তৈরী করা, (২) পুকুরে ডিমপোনা ছাড়া, (৩) পরিপূরক খাদ্যের যোগান দেওয়া ও (৪) ফসল তোলা।

পুকুর তৈরী করা বলতে বোঝায় (ক) জলের ও পাড়ের যাবতীয় আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার, (খ) বিঘা প্রতি জলকরে প্রতি ফুট গভীর জলের জন্য ১০০ কেজি পরিমাণ মহুয়া খোল ব্যবহার করে পুকুরের যাবতীয় মৎস্যভূক মাছ, আগাছা এবং সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি শিশুমাছের শত্রু নির্মূল করা, (গ) চূণ ও সার প্রয়োগ ও (ঘ) ক্ষতিকর পোকামাকড় ধ্বংস করা।

মহুয়া খোল ব্যবহার করা হলে পুকুরে অন্য কোন সার ব্যবহারের জরুরী প্রয়োজন হয় না। দিলেও অল্প মাত্রায় (বিঘা প্রতি ৩০০-৪০০ কেজি) কাঁচা গোবর ব্যবহার করা যেতে পারে। যে সব পুকুর শুকিয়ে যায় সেই সব পুকুরে জল জমার পর বিঘা প্রতি ২০০০-২২০০ কেজি পরিমাণ কাঁচা গোবর সার হিসাবে ব্যবহারেই বাঞ্ছিত সুফল পাওয়া যায়। সার দেওয়ার ৬-৭ দিন আগে এই জাতীয় আঁতুড় পুকুরে বিঘা প্রতি ৩০-৪০ কেজি হিসাবে কলিচূণ ব্যবহার করা একান্ত দরকার। মহুয়া খোল ব্যবহারের ক্ষেত্রে খোল দেওয়ার ৬-৭ দিন পর চূণ দিতে হয় পুকুরে।

মহুয়া খোল ব্যবহারের ১৬-২১ দিনের মধ্যে আঁতুড় পুকুর ডিমপোনা ছাড়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সার হিসাবে শুধু কাঁচা গোবর ব্যবহারেও প্রায় একই রকম সময় লাগে। তবুও এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে তবেই পুকুরে ডিমপোনা ছাড়া উচিত। জলের পি. এইচ-এর মান ৭.৫-৮.৬-এর মধ্যে, জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘাটতি নেই ও পুকুরে প্রাণীকণার প্রাচুর্য আছে— এইসব সম্বন্ধে জেনে ও বুঝে ডিমপোনা ছাড়তে হবে। ডিমপোনা ছাড়ার ১২-২৪ ঘণ্টা আগে বিঘা প্রতি জলকরে ২৮ লিটার হিসাবে কেরোসিন তেল ছড়িয়ে পুকুরের যাবতীয় পোকামাকড় নির্মূল করে নেওয়াও দরকার।

ডিমপোনা ছাড়ার দিন থেকেই আঁতুড় পুকুরে প্রতিদিন পরিপূরক খাদ্য দিতে হয়। সাধারণত চালের কুঁড়ো ও সরষের

খোলের গুঁড়ো মিশিয়ে (১৪১ ওজনে) এই খাদ্যবস্তু তৈরী করা হয়। প্রথম ৫ দিন পুকুরে মজুত ডিমপোনার ওজনের (এক লক্ষের ওজন ১৪০ গ্রাম) ৩-৪ গুণ, দ্বিতীয় ৫ দিন ৫-৬ গুণ এবং এরপরে ৮-১০ গুণ হিসাবে প্রতিদিন খাদ্য দেওয়া যেতে পারে।

আঁতুড় পুকুরে জাল টানা ছোট মাছের পক্ষে 'টনিক'-এর কাজ করে। ডিমপোনা ছাড়ার ৩-৪ দিন পর থেকে একদিন অন্তর অন্তত ৩ দিন $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি বা $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি ফাঁসের (অভাবে ১ ইঞ্চি) জাল টানার পর পুকুরে চটজাল দেওয়া দরকার একদিন অন্তর অন্তত ২ দিন। এরপর যে-কোন দিন পুকুরে চটজাল টেনে উৎপন্ন ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনা ধরে বিক্রি করা বা লালন পুকুরে স্থানান্তরিত করা যায়।

আঁতুড় পুকুরে একই মরশুমে কমপক্ষে চারবার ডিমপোনার চাষ করা যায়। ডিমপোনা চাষের শেষে উৎপন্ন ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনার অধিকাংশ বিক্রি অথবা লালন পুকুরে স্থানান্তরিত করার পর অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক ছোট চারাপোনা আঁতুড় পুকুরেই চাষ করে অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের চারাপোনা এবং পরে উৎপন্ন এই চারাপোনার অধিকাংশ বিক্রি অথবা স্থানান্তরিত করার পর অল্প কিছুসংখ্যক চারাপোনা একই আঁতুড় পুকুরে চাষ করে বছরের শেষে মার-মাছ বা খাওয়ার মাছ (সাধারণত রুই, কাতলা, মৃগেল) উৎপাদন করা যায়। অথবা বিকল্প চাষ হিসাবে সাধারণত রুই, কাতলা, মৃগেলের ডিমপোনার চাষে উৎপন্ন অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের চারাপোনা সম্পূর্ণভাবে আঁতুড় পুকুর থেকে তুলে নিয়ে বিক্রি অথবা অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করার পর বছরের অবশিষ্ট সময়কালের জন্য আঁতুড় পুকুরে মাগুর মাছ চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

আঁতুড় পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেলের ডিমপোনার মতো একই পদ্ধতিতে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কমন কার্পের ডিমপোনারও চাষ করা যায়।

লালন পুকুর পরিচালনা

মাছচাষের সর্বশেষ লক্ষ্য হলো বড় মাছ উৎপাদন করা। বড় মাছ তৈরী করতে অনেক সময় লাগে। তাই বড় মাছের চাষ করতে হয় বড় আয়তনের পালন বা মজুত পুকুরে যেখানে সারা বছর অন্তত ৫-৬ ফুট গভীর জল থাকে। এইসব পুকুরে যেসব চারাপোনা ছেড়ে চাষ করতে হয় সেগুলিও হওয়া দরকার কিছুটা বড় আকারের। স্বভাবতই মাছচাষ কর্মকাণ্ডে বড় আকারের চারাপোনার যথেষ্ট চাহিদা আছে। এইসব বড় সাইজের চারাপোনা ছোট আয়তনের অগভীর আঁতুড় পুকুরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এরজন্য দরকার অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের গভীর পুকুর। সাধারণত ১৫ কাঠা থেকে ১ বিঘা আয়তনের এবং ৪-৫ ফুট জলের গভীর পুকুরই এই ধরনের চাষের কাজে উপযুক্ত। অবশ্য আয়তনে কিছুটা ছোট হলেও (১০-১২ কাঠা) চাষের কাজে অসুবিধা হয় না। যেহেতু এই প্রকারের পুকুরে মাছের ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনা ছেড়ে তাদের দেহের ওজন ও আকার বৃদ্ধির জন্য কয়েক মাস লালন করা হয়, পালন বা মজুত পুকুরে ছাড়ার আগে সেহেতু এইসব পুকুরকে সঙ্গত কারণেই লালন পুকুর বলা হয়।

লালন পুকুরের পরিচালন ব্যবস্থা আঁতুড় পুকুরের মত প্রায় একই ধরনের। এখানেও জলের ও পাড়ের আগাছা, ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল পরিষ্কার করে নিয়ে আঁতুড় পুকুরের মত একই মাত্রায় চূণ, মহুয়া খোল ও কাঁচা গোবর দিয়ে পুকুর তৈরী করে নিতে হয়। তারপর সরষের তেল ও সাবানের মিশ্রণ অথবা কেরোসিন তেল ব্যবহার করে পুকুরের পোকামাকড় মেরে নিয়ে পুকুরে ধানিপোনা অথবা ছোট চারাপোনা ছাড়তে হয়।

সাধারণত আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনার চাষে উৎপন্ন ৭-৮ দিনের ধানিপোনা অথবা ১২-১৫ দিনের ছোট চারাপোনা লালন পুকুরে ছাড়া হয়। ছাড়া মাছের সংখ্যা নির্ভর করে ধানিপোনা ও চারা-পোনার আকার বা সাইজের ওপর। সাধারণভাবে বলা যায় যে ১২-১৩ মিলিমিটার বা গড়ে ১/২ ইঞ্চি সাইজের ধানিপোনা বিঘা প্রতি জলকরে ৭০-৮০ হাজার এবং ২-৩ সেন্টিমিটার বা গড়ে ১ ইঞ্চি সাইজের ছোট চারাপোনা ৩০-৪০ হাজার লালন পুকুরে ছাড়া যেতে পারে (কই, কাতলা, মৃগেল মাছের)।

আঁতুড় পুকুরের মত লালন পুকুরেও পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ধানিপোনা/চারাপোনাকে নিয়মিতভাবে দৈনিক পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্য (১ ঃ ১ অনুপাতে মিশ্রিত সরষের খোলের ও চালের কুঁড়োর গুঁড়ো) খাওয়াতে হয়। খাদ্য দিতে হয় পুকুরে মজুত ধানিপোনা / চারা-পোনার মোট ওজনের শতকরা ৪-৫ ভাগ হিসাবে। এরজন্য পুকুরে ছাড়ার আগে বেশ কিছুসংখ্যক (অন্তত ২০০-২৫০টা) ধানিপোনা / চারাপোনা ওজন করে প্রতিটির গড় ওজন এবং এর ভিত্তিতে ছাড়া ধানিপোনা/চারাপোনার মোট ওজন নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। চুণ, সার দিয়ে উপযুক্তভাবে তৈরী করা পুকুরে ধানিপোনা / চারাপোনা অতি দ্রুত বাড়ে এবং তার ফলে প্রতিদিনই তাদের খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। এইজন্য ১৫ দিন অন্তরই পুকুরে জাল টেনে মাছকে ব্যায়াম করানো ও মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ছাড়াও পুকুরে মজুত ধানিপোনা / চারাপোনার মোট ওজন নতুন করে নির্ধারণ ও সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ স্থির করে নেওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'মাছচাষে অঙ্ক' শীর্ষক অধ্যায়ে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ৬-৭˙৫ সেমি বা মোটামুটি ২॥-৩ ইঞ্চি সাইজের চারাপোনা তৈরী হতে সময় লাগে পুকুরে ছাড়া ১/২ ইঞ্চি সাইজের ধানিপোনার ক্ষেত্রে ৫০-৬০ দিন এবং গড়ে ১ইঞ্চি সাইজের

ছোট চারাপোনার ক্ষেত্রে ৩০-৪০ দিন। ধানিপোনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের চারাপোনার উৎপাদন আশা করা যায় পুকুরে ছাড়া ধানিপোনার মোট সংখ্যার আনুমানিক শতকরা ৬৫ ভাগ এবং ছোট চারাপোনা ছাড়ার ক্ষেত্রে আনুমানিক শতকরা ৭৫ ভাগ। আরও বড় সাইজের চারাপোনা তৈরী করার জন্য এই অবস্থায় লালন পুকুর থেকে উৎপন্ন ২॥-৩ ইঞ্চি সাইজের চারাপোনা বেশীরভাগ সংখ্যায় তুলে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া বা অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করা দরকার। লালন পুকুরে চাষের জন্য রাখা দরকার বিঘা প্রতি জলকরে ৬-৮ হাজার সংখ্যক উপরোক্ত সাইজের চারাপোনা। উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যায় এবং নিয়মিতভাবে পরিপূরক খাদ্যের যোগান দিয়ে আরও ৪০-৫০ দিনের চাষে ৪-৫ ইঞ্চি সাইজের চারাপোনা (বাঁচার হার মজুত চারাপোনার সংখ্যার আনুমানিক শতকরা ৮৫ ভাগ) উৎপাদন করা সম্ভব। বড় সাইজের এই চারাপোনা জীবন্ত অবস্থায় পালন বা মজুত পুকুরে ছেড়ে চাষ করা যায় বড় মাছ বা খাওয়ার মাছ উৎপাদনের জন্য অথবা ঐ একইভাবে ব্যবহারের জন্য মাছচাষীদের কাছে লাভজনক দামে বিক্রি করেও দেওয়া যায়।

ধানিপোনা অথবা ছোট চারাপোনা যা দিয়েই চাষ শুরু করা হোক না কেন একই মরশুমে লালন পুকুর থেকে ২-৩ বার ফসল তোলা যায়, অর্থাৎ, ২-৩ বার অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের চারাপোনা উৎপাদন করা যায়। তবে প্রতিবারেই মাছের বীজ ছাড়ার আগে পুকুরে অবশ্যই চূণ ও গোবর প্রয়োগ করে পুকুরের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। আঁতুড় পুকুরের মত লালন পুকুরেও ১৫ দিন অন্তর রাতে ভেজানো সরষের খোল পরের দিন সকালে বেশী জলে গুলে নিয়ে পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হয়। খোলের পরিমাণ হবে বিঘা প্রতি জলকরে ১২-১৬ কেজি। চারাপোনা উৎপাদনের কাজ শেষ করার পর বছরের ১২ মাসের অবশিষ্ট ৫॥-৬ মাসকাল সময়ে লালন পুকুরে উৎপন্ন রুই, কাতলা, মৃগেলের অল্পসংখ্যক বড়

সাইজের চারাপোনা (আকারভেদে বিঘা প্রতি জলকরে ২-৪ হাজার) রেখে চাষ করে মার-মাছ বা খাওয়ার মাছ উৎপাদন করা যায়। বিকল্প চাষ হিসাবে উৎপন্ন যাবতীয় চারাপোনা তুলে নিয়ে বিক্রি অথবা অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করারপর পুকুরে মাগুর মাছের চারাপোনা ছেড়ে মাগুর মাছের চাষ করা যায়। মাগুর মাছের এই বিকল্প চাষ রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের চাষের তুলনায় অবশ্যই অধিক লাভজনক। এছাড়াও বিকল্প চাষ হিসাবে উৎপন্ন রুই. কাতলা, মৃগেলের যাবতীয় চারাপোনা পুকুর থেকে তুলে নিয়ে আমেরিকান রুই মাছের ডিমপোনা / ধানিপোনা ছেড়ে ২-৩ বার ঐ মাছের চারাপোনা উৎপাদন করা যায়। তবে বিকল্প চাষ হিসাবে শেষোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে মাছের বীজ ছাড়ার আগে অবশ্যই পুকুরে মহুয়া খোল, চূণ, গোবর ইত্যাদি ব্যবহার করে উপযুক্তভাবে পুকুর তৈরী করে নিতে হবে।

সারাংশ

আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনা চাষে উৎপন্ন ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনা চাষ করে অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের চারাপোনা উৎপাদনের জন্য যে প্রকারের পুকুর ব্যবহার করা হয় তাদের বলা হয় লালন পুকুর। সাধারণত ১৫ কাঠা থেকে এক বিঘা আয়তনের ও ৪-৫ ফুট জলের গভীর পুকুর এই ধরনের মাছ-চাষের কাজে উপযুক্ত। তবে কিছুটা ছোট আয়তনের (১০-১২ কাঠা) পুকুরেও চাষে অসুবিধা হয় না।

লালন পুকুরের পরিচালন ব্যবস্থা আঁতুড় পুকুরের মতই প্রায় একই ধরনের। এখানেও আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার, চূণ ও সার প্রয়োগ এবং পোকামাকড় মারা ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রস্তুতিপর্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করার পর পুকুরে মাছের বীজ ছাড়তে হয়। ১/২ ইঞ্চি সাইজের ধানিপোনা বিঘা প্রতি জল-করে ৭০-৮০ হাজার বা গড়ে ১ ইঞ্চি সাইজের ছোট চারা-

পোনা ৩০-৪০ হাজার সংখ্যায় লালন পুকুরে ছাড়া যায়। মজুত-করা ধানিপোনা/চারাপোনার মোট ওজনের শতকরা ৪-৫ ভাগ হিসাবে পরিপূরক খাদ্য (সরষের খোল ও চালের কুঁড়ো) নিয়মিতভাবে দৈনিক মাছকে খাওয়াতে হয়।

ধানিপোনা ছাড়া হলে ৫০ ৬০ দিনের চাষে এবং ছোট চারাপোনা ছাড়ার ক্ষেত্রে ৩০-৪০ দিনের চাষে ২॥-৩ ইঞ্চি সাইজের চারাপোনা উৎপাদন করা যায়। অপেক্ষাকৃত আরও কিছুটা বড় সাইজের (৪-৫ ইঞ্চি) চারাপোনা উৎপাদন করতে হলে আগের পর্যায়ে উৎপন্ন চারাপোনার অধিকাংশ বিক্রি অথবা পালন/মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করে দিয়ে পুকুরে বিঘা প্রতি জলকর হিসাবে ৬-৮ হাজার চারাপোনা রেখে চাষ করার দরকার হয়।

একই মরশুমে একই লালন পুকুর থেকে ২-৩ বার রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের চারাপোনার ফসল তোলা যায়। কিছু সংখ্যক (আকারভেদে বিঘা প্রতি জলকরে ২-৪ হাজার) বাছাই করা বড় সাইজের চারাপোনা পুকুরে রেখে বছরের অবশিষ্ট ৫॥-৬ মাস কালের জন্য চাষ করে বিক্রয়যোগ্য মার-মাছ বা খাওয়ার মাছ উৎপাদন করা যায়। বিকল্প চাষ হিসাবে রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের যাবতীয় চারাপোনা পুকুর থেকে তুলে দিয়ে বিক্রি অথবা অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করার পর পুকুরে মাগুর মাছের চারাপোনা ছেড়ে মাগুর মাছের চাষ করা যায় অথবা মহুয়া খোল, চূণ, গোবর ইত্যাদি ব্যবহার করে উপযুক্তভাবে পুকুর তৈরী করে নিয়ে পুকুরে আমেরিকান রুই মাছের ডিমপোনা/ধানিপোনা ছেড়ে (শীতকালে শুরু করে) ঐ মাছের বিক্রয়যোগ্য চারাপোনা ২-৩ বার উৎপাদন করা যায়।

পালন পুকুরে চাষ
তথা
মিশ্র মাছচাষ

যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে একই পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস্ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মিশ্র চাষ চলে আসছে। ১৫-২০ বছর আগেও পুকুরে মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ডিম-পোনার প্রধান উৎসই ছিল নদী। ফলে, পুকুরে রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছের সঙ্গে সহ-অবস্থান করতো আরও অনেক প্রজাতির মাছ, যেমন বাটা, বেলে, খয়রা, চেলা, চিতল, বোয়াল ইত্যাদি। একই পুকুরে এত বিভিন্ন ধরনের মাছ থাকা সত্ত্বেও মাছের ফলন ছিল কিন্তু খুবই কম। বিঘা প্রতি জলকরে বছরে ৮০ কেজি মতো। এর প্রধান কারণ হল, এই চাষ পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। এতে না ছিল খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক বিচার, না ছিল পুকুরে চারামাছ মজুত করার সংখ্যা নির্ধারণের কোন বাস্তবসম্মত বুদ্ধি প্রয়োগ। মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য পুকুরে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বা মাছকে সরাসরি কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো সম্বন্ধেও মাছচাষীদের কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না বললেই চলে।

আধুনিক মিশ্র মাছচাষের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য : দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা ও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের খাদ্যাভ্যাস, পুকুরের আয়তন অনুযায়ী চারামাছ মজুত করার উপযুক্ত সংখ্যা, বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অনেক মূল্যবান বিষয় সম্বন্ধে এখন আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি। অর্জিত এই জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আধুনিক মিশ্র মাছচাষ প্রযুক্তি ও চাষ পদ্ধতি গড়ে

উঠেছে। এই বিশেষ ধরনের চাষের মূলনীতি হল ঃ একই পুকুরে বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাসের এমন সব প্রজাতির মাছ মজুত করা যারা খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, বরং পরস্পর পরস্পরের সহায়কের কাজ করে এবং পুকুরের আয়তন অনুযায়ী মজুত করার জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চারা-পোনার সংখ্যা ও তাদের পরস্পরের মধ্যে সেই সংখ্যার অনুপাত এমনভাবে নির্দিষ্ট করা যাতে পুকুরের সম্পুর্ণ আবদ্ধ স্থানের ও পুকুরে সৃষ্ট যাবতীয় প্রাকৃতিক খাদ্য সম্পদের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় এবং একই প্রজাতির মাছের মধ্যেও স্থান ও খাদ্যের প্রয়োজনে বিবাদ না হয়। আধুনিক মিশ্র মাছচাষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, পুকুরের বর্তমান অবস্থাগুলির সদ্ব্যবহার করে পুকুরের মাছধারণ করার সর্বোচ্চ ক্ষমতা পর্যন্ত মাছ উৎপন্ন করা। সহজভাবে বলতে হলে, কম জায়গায় কম সময়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ফলনসীমায় পৌছানো।

পুকুরে ছাড়ার জন্য মাছ নির্বাচন ঃ আধুনিক মিশ্র মাছচাষে সাধারণত ছটি প্রজাতির মাছের চারাপোনা পুকুরে মজুত করা হয়। দেশী মাছ কাতলা, রুই ও মৃগেলের সঙ্গে বিদেশী সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কমন কার্প (আমেরিকান রুই) মাছ। কমন কার্পের পরিবর্তে মাগুর মাছ চাষ করা যায়। বাড়তি উৎপাদন ও লাভের জন্য কিছুসংখ্যক গলদা চিংড়ির চারাও ছাড়া যেতে পারে।

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবে প্রাণিজ ও উদ্ভিজ উভয় প্রকার খাদ্যাণুই পুকুরে চক্রাকারে উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশী চাষোপযোগী বিভিন্ন মাছের আসক্তি প্রাণিজ খাদ্যাণুর প্রতিই বেশী। ফলে, শুধু এইসব দেশী মাছের চাষে পুকুরে সৃষ্ট বিপুল পরিমাণ উদ্ভিজ খাদ্যাণুর সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না, উৎপন্ন খাদ্যাণুর বেশীরভাগ অংশই পচে তলদেশে তলানি হয়ে অপচয় হয়। এর সামান্য অংশই মাছের খাদ্য হিসাবে পরবর্তী সময়ে খাদ্য-চক্রের মাধ্যমে ফিরে আসে।

পুকুরে চাষোপযোগী মাছের মধ্যে একমাত্র বিদেশী সিলভার কার্পই খাদ্যের জন্য উদ্ভিজ খাদ্যাণুর ওপর নির্ভরশীল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুকুরের উদ্ভিজ খাদ্যাণুর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য মিশ্র মাছচাষে রুই, কাতলা, মৃগেলের সঙ্গে পুকুরে সিলভার কার্প মাছের চারা-পোনাও মজুত করা হয়।

কাতলা, রুই ও মৃগেল মাছ পুকুরের বিভিন্ন স্তরে থাকে এবং এদের খাদ্যাভ্যাসও বিভিন্ন। খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এদের পরস্পরের মধ্যে তাই কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। সিলভার কার্প কাতলার মত জলের ওপরের স্তরে থাকে। একই স্তরে বাস করলেও খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন হওয়ায়, যুক্তির বিচারে এই দুই প্রজাতির মাছের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কোন বিবাদ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় সিলভার কার্প কাতলার খাদ্যেও কিছুটা ভাগ বসায়, যার ফলে মিশ্র চাষের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাতলার ফলন আশানুরূপ হয় না। মিশ্র মাছচাষ প্রযুক্তির এটি একটি বাস্তব সমস্যা, যদিও পুকুরে সৃষ্ট উদ্ভিজ খাদ্যাণুর সদ্ব্যবহারের জন্য এখনও পর্যন্ত সিলভার কার্পের কোনও বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায় নি।

মিশ্র মাছচাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে গ্রাস কার্পের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এরা রুই মাছের সঙ্গে একই স্তরে (মাঝের) বাস করলেও রুই-এর খাদ্য খায় না। পুকুরের অন্য কোন প্রজাতির মাছের খাদ্যের প্রতিও এরা দৃষ্টি দেয় না। পুকুরে নরম জাতের উদ্ভিদ, ঘাস, ঝাঁঝি ইত্যাদি থাকলে এরা কেবলমাত্র তাই খায়। এই জাতীয় খাদ্য পুকুরে নিঃশেষ হয়ে গেলে বাইরে থেকে এদের খাদ্যের যোগান দিতে হয়। কাঁটা ঝাঁঝিই এদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। অভাবে কলাগাছের পাতা, নানা জাতীয় ঘাস, কপির পাতা ইত্যাদি এদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। দেখা গেছে, এরা দৈনিক নিজেদের দেহের ওজনের সমান ওজনের তো বটেই, এমনকি তার চেয়েও বেশী পরিমাণে ঘাস বা ঝাঁঝি জাতীয় জলজ উদ্ভিদ অনায়াসে খেতে পারে। তবে এই

খাদ্যের সবটাই যে এরা পরিপাক করতে পারে তা নয়। বেশকিছু অংশ আধ-হজম বা বদ-হজম মল হিসাবে বর্জিত হয়। গ্রাস কার্পের বর্জিত এই মল পুকুরের অন্যান্য মাছ, বিশেষ করে রুই মাছ, সরাসরি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং এইভাবে গ্রাস কার্প অন্যান্য প্রজাতির মাছকে খাদ্য জুগিয়ে তাদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এ ছাড়াও গ্রাস কার্পের বর্জিত মল প্ল্যাংকটন বা মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের পক্ষে ভাল উর্বরকও বটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাস কার্পের পরিমিত খাদ্য সংগ্রহে যদি কোন বাস্তব অসুবিধা না থাকে তাহলে অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে পুকুরে বেশী সংখ্যায় গ্রাস কার্প মজুত করা হলে গ্রাস কার্পের বর্জিত মল থেকে পুকুরের অন্যান্য মাছের পরিপাকযোগ্য যে পদার্থ পাওয়া যাবে এবং তা থেকে যে পরিমাণ প্ল্যাংকটন তৈরী হবে তার ওপর নির্ভর করে পুকুরে সার প্রয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে হয়। এর ফলে উৎপাদন খরচ তো কমবেই, বেশী সংখ্যায় গ্রাস কার্প থাকায় মাছের মোট উৎপাদনও বেড়ে যাবে।

কমন কার্প সর্বভূক, খুঁটে খেতেও অভ্যস্ত। তাই মৃগেলের সঙ্গে জলের নীচের স্তরে একসঙ্গে বাস করলেও কমন কার্প মৃগেলের খাদ্যের ওপর নির্ভর করে না, এদের পরস্পরের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় না।

কমন কার্পের পরিবর্তে মাগুরের চাষ করা হলে দেখতে হবে পুকুর থেকে মাগুর মাছ ধরার অসুবিধা আছে কী না। জলের গভীরতা খুব বেশী হলে এবং পুকুর আয়তনে খুব বড় হলে মাগুর ধরা বেশ শক্ত কাজ। কমন কার্প ধরাও বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে কমন কার্পের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুবিধা আছে। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে কমন কার্পের স্ত্রী মাছের পেটে প্রচুর ডিম এসে যায়, পুরুষ মাছও মিষ্টযুক্ত (শুক্ররস) হওয়ায় পেটমোটা ও ভারী আকারের হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় এরা বেশী ছোটাছুটি করতে পারে না বলে পুকুরে জাল দিলে সহজেই ধরা পড়ে। তবে এই ব্যাপারে

প্রথম বছরে কমন কার্পের সঙ্গে কিছু সংখ্যায় মাগুর মাছ পুকুরে ছেড়ে সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ এবং পরের বছর থেকে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুকুর বিশেষে চাষের উপযুক্ত মাছ নির্বাচন করাই বাস্তবসম্মত কাজ হবে। মাগুর মাছ চাষ করতে হলে পুকুরে মাগুরের চারাপোনা ছাড়তে হবে বর্ষার পরে। পুকুরের তলদেশ বেশী পাঁকযুক্ত না হলে অন্যান্য প্রজাতির মাছের সংখ্যা না কমিয়েও পুকুরে অল্প সংখ্যায় (বিঘা প্রতি জলকরে ৪০০-৫০০ টি) গলদা চিংড়ির চারা ছাড়া যেতে পারে। আবার, নীচের স্তরের মাছ মৃগেল ও আমেরিকান রুই-এর সংখ্যা কিছুটা কম করে (সিকিভাগ পরিমাণ) তার পরিবর্তে বিঘা প্রতি জলকরে ১৬০০-২০০০ সংখ্যক গলদা চিংড়ির চারা ছেড়ে চাষ করা যেতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে চিংড়িকে খাওয়ানোর জন্য বাইরে থেকে বাড়তি কোন পরিপূরক খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য এবং পুকুরের অন্যান্য মাছের জন্য দেওয়া পরিপূরক খাদ্য থেকেই মজুত অল্পসংখ্যক গলদা চিংড়ির চারা নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অবশ্য গলদা চিংড়িকে খাওয়ানোর জন্য বাইরে থেকে পৃথকভাবে বাড়তি পরিপূরক খাদ্য দিতে হয়। 'মিষ্টি জলে গলদা চিংড়ির চাষ' শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মজুত করা চারাপোনার সংখ্যা, আকার ও বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে অনুপাত : মিশ্র মাছচাষ প্রযুক্তির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, জলের আয়তন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যায় এবং বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পুকুরে চারাপোনা মজুত করা। সাধারণত বিঘা প্রতি জলকরে এক হাজার চারাপোনা ছাড়া হয় এই অনুপাতে—কাতলা ১০০, সিলভার কার্প ২০০, রুই ৩০০, গ্রাস কার্প ১০০, মৃগেল ১৫০ও কমন কার্প ১৫০। পুকুরের বিশেষ গুণাগুণ বিচারে এই সংখ্যার ও অনুপাতের কিছুটা তারতম্য করা যায়। কমন কার্পের পরিবর্তে মাগুর মাছের চারাপোনা ছাড়া হলে,

পুকুরের তলদেশের সম্পূর্ণ জায়গার পরিপূর্ণ ব্যবহার সুনিশ্চিত করে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি কমন কার্পের চারাপোনার পরিবর্তে মাগুরের চারাপোনা ছাড়া দরকার ১০টি (এক বছরের চাষে প্রতিটি কমন কার্পের গড় ওজন ৭০০ গ্রাম এবং বর্ষার পর মাগুরের চারাপোনা ছেড়ে ৫-৬ মাসের চাষে মাগুর মাছের প্রতিটির গড় ওজন ৭০ গ্রাম হিসাবে ধরে)। এই হিসাব অনুযায়ী বিঘা প্রতি জলকরে ১৫০টি কমন কার্পের চারাপোনার পরিবর্তে মাগুরের চারাপোনা ছাড়া দরকার ১৫০০টি এবং সেক্ষেত্রে পুকুরে ছাড়া চারাপোনার (বিভিন্ন প্রজাতির) মোট সংখ্যা দাঁড়াবে এক হাজারের পরিবর্তে ২৩০০টি।

মিশ্র মাছচাষের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, পুকুরে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের চারাপোনা মজুত করা। চারাপোনার সাইজ ৪-৫ ইঞ্চির কম হওয়া উচিত নয়। এছাড়া মোটামুটি একই সাইজের মাছ ছাড়া উচিত, যাতে এক সাইজের কোন এক প্রজাতির সঙ্গে অন্য আর এক প্রজাতির ভিন্ন সাইজের মাছের কিংবা একই প্রজাতির বিভিন্ন সাইজের মাছের দলের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকে।

মিশ্র মাছচাষের উপযুক্ত পুকুর ঃ কিছুটা বড় আয়তনের যে সব পুকুরে বছরের অধিকাংশ সময় ৫-৬ ফুট গভীর জল থাকে সেই-সব পুকুরই মিশ্র মাছচাষের জন্য উপযুক্ত। এই হিসাবে অধিকাংশ পালন বা মজুত পুকুরে এই পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। সাধারণত এক বিঘার কম আয়তনের পুকুরে এই পদ্ধতিতে চাষ অলাভজনক হয়ে পড়ে। আবার খুব বড় আয়তনের পুকুরে এই বিশেষ ধরনের চাষের প্রয়োজনীয় সবরকম সর্ত ও নিয়মাবলী বাস্তবক্ষেত্রে মেনে চলা শক্ত। সাধারণভাবে বলা যায় যে এক বিঘা থেকে সাত-আট বিঘার মধ্যে যে কোন আয়তনের পুকুরে এই বিশেষ ধরনের চাষ করা যায়। প্রয়োজনীয় সবরকম সাজ-সরঞ্জাম, সুযোগ-সুবিধা, অর্থ বিনিয়োগ এবং সর্বোপরি দক্ষ পরিচালনার সুব্যবস্থা করতে

পারলে আরও বড় আয়তনের জলাশয়কেও মিশ্র মাছচাষের আওতায় আনা সম্ভব।

পুকুর তৈরী ও চারাপোনা মজুত করা : কচুরীপানা, টোপাপানা ও অন্যান্য আগাছা পুকুর থেকে নির্মূল করে তুলে নিয়ে পুকুরে মহুয়া খোল বা কাঁচা গোবর দিতে হয়। পুকুরে মাছখেকো মাছ, যেমন শাল, শোল, চিতল, বোয়াল ইত্যাদি, কিংবা চাঁদা, ফলুই ও তিলাপিতা মাছ থাকলে মহুয়া খোল অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে প্রতি বিঘা জলকরে প্রতি এক ফুট জলের গভীরতার জন্য ১০০ কেজি হিসাবে। আর যে সব পুকুরে এইসব ক্ষতিকারক মাছ নেই সেখানে মহুয়া খোলের বদলে কাঁচা গোবর ব্যবহার করা যেতে পারে বিঘা প্রতি ১৬০০ কেজি হিসাবে। মহুয়া খোল ব্যবহারের পরেও অল্প পরিমাণে (বিঘা প্রতি ৩০০-৪০০ কেজি হিসাবে) কাঁচা গোবর ব্যবহার করা যেতে পারে। মহুয়া খোল ব্যবহারের ৭ দিন পর পুকুরে চূণ দিতে হয়, বিঘা প্রতি ৩০-৪০ কেজি হিসাবে। গোবর ব্যবহার করা হলে প্রথমে চূণ ব্যবহার করে তার ৬-৭ দিন পর পুকুরে গোবর দিতে হয়। শুধু মহুয়া খোল বা শুধু গোবর ব্যবহার করা হলে সাধারণত ১৬-২১ দিনের মধ্যেই পুকুর উপযুক্তভাবে তৈরী হয় মাছ ছাড়বার জন্য। খোল ও গোবর ব্যবহার করা হলে সময় লাগে প্রায় ৩০ দিন। তবুও জলের পি-এইচ, খাদ্যাণুর উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে বুঝে নিয়ে মাছ ছাড়া উচিত। এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'আঁতুড় পুকুর পরিচালনা' শীর্ষক অধ্যায়ে। তবে আঁতুড় পুকুরে পোকামাকড় মারার জন্য তেল-সাবান মিশ্রণ বা কেরোসিন তেল ব্যবহার করা অপরিহার্য হলেও মিশ্র মাছ-চাষের পুকুরে এই প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। মাছ ছাড়তে হয় পূর্বে-বর্ণিত জলকরের আয়তন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যায়, বিভিন্ন প্রজাতির মাছের নির্দিষ্ট অনুপাতে ও আকারে।

সার প্রয়োগ : মিশ্র মাছচাষ প্রযুক্তির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পুকুরে নিয়মিতভাবে ও পর্যায়ক্রমে জৈব ও অজৈব

বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ। মহুয়া খোল বা গোবর দিয়ে পুকুর তৈরী করে নিয়ে চারাপোনা মজুত করার ১৫ দিন পরেই রাসায়নিক সার হিসাবে ইউরিয়া ও সুপারফসফেট প্রয়োগ করতে হয়। বিঘা প্রতি জলকরে ইউরিয়া ৩ কেজি ও সুপারফসফেট (সিংগল) ৫ কেজি হিসাবে দিতে হয়। রাসায়নিক সার প্রয়োগের ১৫ দিন পর জৈব সার হিসাবে কাঁচা গোবর দিতে হয় বিঘা প্রতি ১৫০-১৬০ কেজি হিসাবে। প্রতিবার জৈব ও রাসায়নিক সার দেওয়ার অন্তত ৩-৪ দিন আগে পুকুরে চূণ প্রয়োগ করতে হয় বিঘা প্রতি ৩-৪ কেজি হিসাবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে চূণ এবং জৈল ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয় পুকুরে একাদশ মাস পর্যন্ত, দ্বাদশ মাসে পুকুরের যাবতীয় মাছ তুলে বিক্রি করে দেওয়ার আগের মাস পর্যন্ত।

মাছকে পরিপূরক খাদ্য খাওয়ান : মিশ্র মাছচাষে উৎপাদন ব্যয়ের সিংহভাগটাই যায় পুকুরে মজুত মাছকে পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো খাতে। মাছ ছাড়ার পরপরই মাছকে দৈনিক কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াতে হয়। সাধারণত চালের কুঁড়ো ও সরষের খোল ১ : ১ (ওজনে) অনুপাতে মিশিয়ে দৈনিক সকালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পুকুরের নির্দিষ্ট ২-৩ জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হয়— অর্ধেক পরিমাণ শুকনো অবস্থায় এবং বাকী অর্ধেকটা জলে মেখে মণ্ডাকারে। খাদ্য দিতে হয় মজুত মাছের মোট ওজনের শতকরা ২-৪ ভাগ হিসাবে দ্বাদশ মাসে মাছ বিক্রি শুরু করার আগের দিন পর্যন্ত। মজুত মাছের মোট ওজন ও সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ মাছ ছাড়ার দিন এবং পরে প্রতি মাসে কীভাবে নির্ধারণ করতে হয় সে সম্বন্ধে উদাহরণের সাহায্যে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'মাছচাষে অঙ্ক' শীর্ষক অধ্যায়ে।

ওপরে বর্ণিত কুঁড়ো ও সরষের খোলের মিশ্রণ সব প্রজাতির মাছ খেলেও গ্রাস কার্প (কিছুটা বড় আকারের) খায় না। বাইরে থেকে কাঁটা ঝাঁঝি বা নরম ঘাস যোগান দিয়ে এদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। পুকুরের জলের মধ্যে ৪টি বাঁশের খুঁটি পুঁতে নারকেলের

দড়ি দিয়ে খাটিয়ার মত বর্গাকারে বা আয়তক্ষেত্রের আকারে একটি বা দুটি ভাসমান বেষ্টনী তৈরী করা হয়। দড়ির বুনুনির কাজ করা হয় এমনভাবে যাতে ছোট ছোট অনেক ফোকরের সৃষ্টি হয়। গ্রাস কার্প বেষ্টনীর নীচের দিক থেকে ওইসব ফোকরের ভেতর দিয়ে দড়ির বুনুনির ওপর দেওয়া ঝাঁঝি বা ঘাস অল্প অল্প পরিমাণে টেনে নিয়ে খেতে পারে। সাধারণত পুকুরে মজুত করা গ্রাস কার্পের মোট ওজনের সমান পরিমাণ ঝাঁঝি বা ঘাস দিয়ে শুরু করতে হয়। খাওয়ার ধরন অর্থাৎ প্রদত্ত খাদ্যের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হচ্ছে কী না তা বাস্তবে দেখে ও বুঝে নিয়ে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে হয়।

কমন কার্পের পরিবর্তে পুকুরে মাগুর মাছ ছাড়া হলে কিছুটা অন্য ধরনের কৃত্রিম খাদ্য দেওয়ার দরকার হয়। অন্যান্য প্রজাতির মাছের জন্য যে খাদ্য দেওয়া হয় মাগুর মাছ তা থেকে কিছুটা অংশ পেলেও পরিমাণগত ও গুণগত বিচারে তা তাদের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। মাগুর মাছ রাতেই খাদ্য বেশী খায়। তাই রাতের খাদ্য নিয়মিতভাবে ও উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া দরকার এদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য। এই বিশেষ ধরনের খাদ্যের প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'মাগুর মাছের চাষ' শীর্ষক অধ্যায়ে।

বিক্রি করার জন্য মাছ ধরা : একটি বিশেষ সীমায় পৌঁছানোর পর পুকুরের উর্বরতা বা উৎপাদিকা শক্তি প্রচুর সার প্রয়োগেও আর বাড়তে চায় না। মাছের বৃদ্ধিও সব সময় একই হারে হয় না এবং লালনপালনের বা চাষের সময়কালের সঙ্গে তা সমানুপাতিকও নয়। তাই দেখা যায়, যে কোন ধরনের মাছচাষে কোন একটি সময়কাল পার হয়ে যাওয়ার পর উৎপাদন নিম্নমুখী হতে শুরু করে। এইসব তত্ত্ব ও পরীক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে মিশ্র মাছচাষে মাছের লালন-পালনের সময়কাল তথা ফসলচক্রের মেয়াদকাল স্থির করা হয়েছে এক বছর। মিশ্র মাছচাষ পরিচালনায় প্রতি মাসে পুকুরে জাল

দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বৃদ্ধির ধরন ও ফলাফল পরিমাপ করার ব্যবস্থা আছে। এই থেকে কোন্ প্রজাতির মাছের উৎপাদন হার কখন থেকে কমতে শুরু করে তা জানা যায়। আবার, প্রতিটি প্রজাতির এমনকি প্রতিটি পৃথক পৃথক মাছের বৃদ্ধির সঙ্গে পুকুরের মোট উৎপাদনের যেমন একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে তেমনি ফলনের সঙ্গেও পুকুরে মাছের নিবিড়তার (মাছ মজুতের পরিমাণগত অবস্থা) একটি বিপরীত সম্পর্কও আছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায় যে মিশ্র মাছচাষে ভাল ফলন পেতে হলে মজুত মাছের সংখ্যা ও পুকুরের মাছধারণ ক্ষমতার মধ্যে সব সময় কিছুটা ব্যবধান থাকা দরকার, যদিও এই বিশেষ ধরনের চাষের লক্ষ্যই হল পুকুরের মাছ-ধারণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা পর্যন্ত মাছ উৎপন্ন করা।

পুকুরের মাছধারণ ক্ষমতা ও মজুত মাছের সংখ্যার মধ্যে কিছুটা ব্যবধান বজায় রাখার একমাত্র বাস্তবসম্মত পন্থা হল মাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের বিক্রয়যোগ্য মাছ ধরে নেওয়া। এতে পুকুরে মাছের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে অবশিষ্ট মজুত মাছ বাড়বার জন্য বেশী জায়গা পাবে। আংশিক ফসল তোলার এই পদ্ধতি অনুযায়ী ওপরের স্তরের মাছের ক্ষেত্রে বড় আকারের কেবলমাত্র সিলভার কার্প অপসারণ করে কাতলাকে সম্পূর্ণ মেয়াদকাল পর্যন্ত যদি পালন করা হয় তাহলে কাতলা-সিলভার কার্পের মিশ্র চাষজনিত সমস্যারও কিছুটা সমাধান আশা করা যায়। অন্যান্য স্তরের মাছের ক্ষেত্রে অবশ্য সব প্রজাতিরই বিক্রয়যোগ্য মাছ তুলে নেওয়া যেতে পারে। কারও কারও মতে আংশিক ফসল তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপসারণজনিত সংখ্যা-হ্রাস পূরণ করা দরকার নতুন করে কিছুটা বড় আকারের (অন্তত ৫-৬ ইঞ্চি) সমসংখ্যক চারাপোনা পুকুরে ছেড়ে। তবে শেষোক্ত এই পদ্ধতিতে চাষে মাছের সর্বশেষ ফলন পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে (অপসারিত মাছের সংখ্যা পূরণ না করে) অথবা সম্পূর্ণ মেয়াদকাল (১২ মাস) পর্যন্ত পুকুরে ছাড়া সব মাছের চাষের তুলনায় অপেক্ষা-

ক্বত বেশী হবে কী না, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলা শক্ত, কারণ এই সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তুলনামূলক পরিসংখ্যানের একান্ত অভাব। একমাত্র বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে মাছচাষীকে এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশী লাভজনক পদ্ধতিটিই বেছে নিতে হবে। আংশিক ফসল তুলে নেওয়া ও সেই সঙ্গে সমসংখ্যক চারামাছ পুকুরে ছেড়ে সংখ্যা পূরণ করা—এই পদ্ধতিতে চাষ করতে হলে মাছচাষীকে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখতে হবে সেগুলি হল :

(১) পুকুরে ছাড়ার জন্য প্রয়োজনমত অপেক্ষাকৃত বড় আকারের চারাপোনা বছরের সব সময় সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব কী না ;

(২) স্বাভাবিক কারণেই বছরের বিভিন্ন সময়ে ছাড়া এইসব চারাপোনা চাষের মেয়াদ শেষে প্রাথমিক পর্যায়ে মজুতকরা চারাপোনার তুলনায় কম বাড়বে এবং ছোট আকারের হবে। এইসব ছোট আকারের মাছের, বিশেষ করে সিলভার কার্প ও কমন কার্পের, স্থানীয় বাজারে চাহিদা আছে কী না ;

(৩) পুকুরের মাঝের স্তরের রুই মাছ ও নীচের স্তরের মৃগেল ও কমন কার্প মাছ গ্রাস কার্পের রেচন পদার্থ (মল হিসাবে পরিত্যক্ত) খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। বড় আকারের গ্রাস কার্প থেকেই এই বাড়তি সুবিধাটি পাওয়া যায়। বড় আকারের গ্রাস কার্প ধরে নিয়ে সংখ্যা পূরণের জন্য গ্রাস কার্পের চারাপোনা পুকুরে ছাড়া হলে মাছচাষী এই সুবিধালাভ থেকে অনেকটা বঞ্চিত হবেন ;

(৪) এক কেজির কম ওজনের মাছের এবং এক কেজি বা এক কেজির বেশী ওজনের মাছের বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। স্বভাবতই বিক্রয়যোগ্য মাছ ধরার কর্মসূচীতে এর প্রভাব থাকবে যেহেতু সামগ্রিকভাবে মিশ্র মাছচাষের অর্থনীতি এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও মিশ্র মাছচাষে এক বছরে দুটি ফসল তোলাও সম্ভব। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে উৎপন্ন অধিকাংশ মাছের

আকার হবে মাঝারী বা টেবিল-সাইজ। যে-সব পুকুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসেও অন্তত ৪-৪।। ফুট গভীর জল থাকে সেইসব পুকুরেই বিশেষ ধরনের এই দো-ফসলী চাষ সম্ভব। পুকুরের অবস্থাভেদে মহুয়া খোল কিংবা গোবর ব্যবহার করে ফাল্গুন মাসের মধ্যেই পুকুর তৈরী করে নিতে হয়। তারপর ৫-৬ ইঞ্চি সাইজের বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চারাপোনা সংগ্রহ করে পুকুরের আয়তন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যায় ও বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে পুকুরে মজুত করতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী সার প্রয়োগ ও দৈনিক পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্যের যোগান দিয়ে শ্রাবণ মাসের মধ্যে পুকুর থেকে যথা-সম্ভব সব মাছ তুলে বিক্রি করে দিতে হবে। দেখা গেছে এই ৫ মাসের চাষে ৪০০-৮০০ গ্রাম ওজনের মাছ উৎপন্ন করা সম্ভব।

এইভাবে প্রথম ফসল তুলে নেওয়ার পর পুকুরে নতুন করে চারাপোনা মজুত করা হয় এবং একই পদ্ধতিতে প্রায় ৭ মাস সময়-কাল পর্যন্ত মাছকে পালন করা হয়। দেখা গেছে, এই সময়ের চাষেও গড়ে ৫০০ গ্রাম ওজনের মাছ উৎপন্ন করা যায়। দো-ফসলী এই ধরনের মিশ্র মাছচাষ একদিক থেকে অধিক লাভজনক, কারণ, এতে নিয়োজিত মূলধনের বিনিয়োগ অপেক্ষাকৃত কম, বিনিয়োগ দ্রুত উঠে আসে এবং দ্বিতীয় দফায় চাষের জন্য মাছচাষীর বাইরে থেকে মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না।

চাষের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা ঃ মিশ্র মাছচাষে জৈব ও অজৈব উভয়প্রকার সারই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। গ্রাস কার্পের খাদ্য হিসাবে ঝাঁঝি, ঘাস ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয় বিপুল পরিমাণে। এর ফলে মাছের পচনশীল মল ও আবর্জনার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সব মিলে পুকুরের তলদেশে অনেক সময় মাটির পচন ও বিভাজন ক্ষমতার মাত্রাধিক জৈব পদার্থের তলানি সঞ্চিত হয়ে ও পচে জল দূষিত হওয়ার কারণ ঘটে। এইভাবে পরিবেশ দূষণের ফলে মাছের রোগাক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট আশংকা থাকে। মাছ চাষেরই অঙ্গ হিসাবে কিছু কিছু প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া হলে

মাছের পক্ষে ক্ষতিকারক এইরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি রোধ করা যায়। পুকুরে নিয়মিতভাবে চূণ প্রয়োগ করা ছাড়াও ১৫ দিন অন্তর বিঘা প্রতি জলকরে ১০০-১৫০ গ্রাম পটাশ পারম্যাঙ্গানেট জলে গুলে ছড়িয়ে দিলে পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এছাড়া পুকুরে প্রতি তিনমাসে একবার ০·১-০·২ পি. পি. এম মাত্রায় জলে দ্রবণীয় ৫০% গ্যামাক্সিন (৬·২৫% বেঞ্জিন হেক্সা-ক্লোরাইডযুক্ত) ব্যবহার পুকুরের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে বিশেষ সাহায্য করে। প্রতিমাসে পুকুরে জাল দিয়ে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গড় ওজন নির্ণয় করার পর পুকুরে পুনরায় ছাড়ার আগে জালে আটকানো সমস্ত মাছকে অল্প অল্প সংখ্যায় একটি বড় পাত্রে রাখা পটাশ পারম্যাঙ্গানেট গোলা জলে (১ পি. পি. এম মাত্রায়) ডুবিয়ে নেওয়া হলে মাছের দেহে রোগ সংক্রমণের আশংকা কমে যায়।

মিশ্র মাছচাষে আয়-ব্যয়ঃ 'বিভিন্ন ধরনের মাছচাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব' শীর্ষক অধ্যায়ে মিশ্র মাছচাষে আয় ও ব্যয়ের আনু-মানিক হিসাব বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। স্পষ্টতঃই মিশ্র মাছ-চাষ প্রক্রিয়া বেশ ব্যয়বহুল। এক হেক্টর বা সাড়ে সাত বিঘা জল-করে ১২ মাস মেয়াদের বিশেষ ধরনের এই চাষে খরচ পড়ে আনু-মানিক ৩০ হাজার টাকা। অবশ্য আয়ের পরিমাণও কম আকর্ষণীয় নয়। বছর শেষে হেক্টর প্রতি জলকর থেকে ৪-৫ হাজার কেজি বড় মাছের ফলন খুবই আশা করা যায়। বিধিবদ্ধ চাষ-প্রণালী নিয়মমাফিক মেনে চলে প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ এবং পুকুরের তদারকি ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারলে মিশ্র মাছচাষ প্রযুক্তি যে সামগ্রিকভাবে দেশের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির একটি অত্যন্ত কার্যকরী বড় হাতিয়ার সে-বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না।

আধুনিক মিশ্র মাছচাষ বলতে একই পুকুরে একসঙ্গে বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাসের এমন সব বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চাষ করা বোঝায় যারা খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিবাদ করে না। পুকুরের আয়তন অনুযায়ী মজুত করার জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চারাপোনার সংখ্যা এবং পরস্পরের মধ্যে সেই সংখ্যার অনুপাত এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয় যাতে পুকুরের সম্পূর্ণ আবদ্ধ স্থানের ও পুকুরে সৃষ্ট যাবতীয় প্রাকৃতিক খাদ্য-সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার হয়। এই বিশেষ ধরনের চাষের উদ্দেশ্য হল পুকুরের বর্তমান অবস্থাগুলির সদ্ব্যবহার করে পুকুরের মাছ ধারণ করার সর্বোচ্চ ক্ষমতা পর্যন্ত মাছ উৎপন্ন করা। আরও সহজভাবে বলা যায়, কম জায়গায় কম সময়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ফলসীমায় পৌঁছানো।

মিশ্র মাছচাষে সাধারণত ছটি প্রজাতির মাছ একসঙ্গে চাষ করা হয়। এর মধ্যে তিনটি দেশী মাছ, কাতলা, রুই ও মৃগেল এবং বাকী তিনটি বিদেশী মাছ, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কমন কার্প (আমেরিকান রুই)। বিঘা প্রতি জল-করে সাধারণত ৪-৫ ইঞ্চি সাইজের ১০০০ চারাপোনা মজুত করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির পরস্পরের মধ্যে অনুপাত রাখা হয় এইরকম ঃ কাতলা ১ : সিলভার কার্প ২ : রুই ৩ : গ্রাস কার্প ১ : মৃগেল ১৫ : কমন কার্প ১.৫। কমন কার্পের বদলে মাগুর মাছের চাষ করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি কমন কার্পের পরিবর্তে ১০টি মাগুরের চারাপোনা মজুত করা দরকার।

সাধারণত এক বিঘা থেকে সাত-আট বিঘার মধ্যে যে কোন আয়তনের পুকুরে বিশেষ ধরনের এই চাষ করা যায়। এইসব পুকুরে বছরের সব সময় অন্তত ৫-৬ ফুট গভীর জল থাকা দরকার। দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারলে

আরও বড় আয়তনের জলকরকে এই চাষ পদ্ধতির আওতায় আনা সম্ভব।

আগাছা, জঙ্গল ইত্যাদি পরিষ্কার করে নিয়ে পুকুরের অবস্থাভেদে মহুয়া খোল অথবা গোবর দিয়ে পুকুর তৈরী করে নিতে হয় মাছ ছাড়ার আগে। বিঘা প্রতি জলকরে প্রতি এক ফুট জলের গভীরতার জন্য ১০০ কেজি মহুয়া খোল দেওয়ার দরকার হয়। গোবর দিতে হয় বিঘা প্রতি জলকরে ১৬০০ কেজি। চূণ ব্যবহার করতে হয় বিঘা প্রতি ৩০-৪০ কেজি।

মিশ্র মাছচাষে জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার সারই ব্যবহার করা হয় পর্যায়ক্রমে ১৫ দিন অন্তর। জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা কাঁচা গোবর বিঘা প্রতি ১৫০-১৬০ কেজি হিসাবে। অজৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় রাসায়নিক সার, ইউরিয়া ও সিংগল সুপারফসফেট বিঘা প্রতি যথাক্রমে ৩ কেজি ও ৫ কেজি মাত্রায়। প্রতিবার সার প্রয়োগের অন্তত ৩-৪ দিন আগে বিঘা প্রতি ৩-৪ কেজি হিসাবে চূণ অবশ্যই ব্যবহার করা দরকার সার প্রয়োগের সুফল লাভের জন্য।

পুকুরে মজুত মাছকে প্রতিদিন পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াতে হয় মাছের মোট ওজনের (গ্রাস কার্প বাদে) শতকরা ২-৪ ভাগ পরিমাণে। সাধারণত চালের কুঁড়ো ও সরষের খোলের মিশ্রণ (১ : ১ ওজন অনুপাতে) ব্যবহার করা হয় খাদ্য হিসাবে। গ্রাস কার্পকে দেহের মোট ওজনের সম-ওজন পরিমাণে কাঁটা ঝাঁঝি, ঘাস ইত্যাদি খাওয়াতে হয়।

মিশ্র মাছচাষের মেয়াদকাল ১২ মাস। চূণ ও সার দেওয়া হয় একাদশ মাস পর্যন্ত, কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হয় দ্বাদশ মাসে মাছ ধরে বিক্রি শুরু করার আগের দিন পর্যন্ত। মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের বিক্রয়যোগ্য মাছ তুলে আংশিক ফসল বিক্রি করা যেতে পারে। এতে পুকুরের অবশিষ্ট মাছ বাড়বার জন্য বাড়তি জায়গা পায়।

মিশ্র মাছচাষ প্রক্রিয়া বেশ ব্যয়বহুল। বস্তুতপক্ষে অপ্রিয় শোনালেও, এই বিশেষ ধরনের চাষ মুর্খ ও অনুদান-নির্ভর দরিদ্রের উপজীবিকা হতে পারে না, কেননা প্রতি হেক্টর জল-করে এই চাষে খরচ পড়ে আনুমানিক ৩০,০০০ টাকা, যদিও বছরে উৎপাদন হতে পারে গড়ে ৪৫০০ কেজি বিক্রয়যোগ্য মাছ যার মূল্য আনুমানিক ৬০,০০০ টাকা। বিশেষ প্রচেষ্টায় ও সুদক্ষ পরিচালনায় ফলনের হার আরও বেশী করা সম্ভব। দেশে সামগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির তাগিদে, গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বনির্ভর কর্ম-সংস্থানের উদ্যোগে মিশ্র-মাছচাষ প্রযুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যদি অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে আগ্রহী মাছ চাষীদের প্রয়োজনীয় মূলধন ও প্রযুক্তির যোগান দিতে সরকার ও দেশের গ্রামীণ ব্যাংকগুলি আগ্রহী ও তৎপর হন।

মাগুর মাছের চাষ

দেশে সামগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদন বাড়াতে হলে রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের চাষকে কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে পুকুরে অন্য যে জাতীয় মাছের চাষে সবচেয়ে অল্প সময়ে বেশী লাভবান হওয়া যায় তা হল মাগুর মাছের চাষ। যে কোন পুকুরে এই মাছ চাষ করা যায়। মাত্র ৫-৬ মাসের চাষেই বিক্রয়যোগ্য ফলন পাওয়া যায়। পুকুর সংস্কারের প্রয়োজন হয় না। পুকুরে সার ব্যবহারেরও দরকার হয় না, বাইরে থেকে কৃত্রিম খাদ্যের যোগান দিয়ে এই মাছের চাষ করা যায়। মাগুর মাছ পুকুরের তলদেশের ময়লা-আবর্জনা, অন্যান্য মাছের বর্জ্য পদার্থ এবং তলদেশের পচনশীল প্রোটিন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে মাছচাষের জন্য প্রয়োজনীয় সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রতি ইউনিট এলাকায় মাগুর মাছের উৎপাদনের হারও রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের উৎপাদনের হারের তুলনায় কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বেশী। বছরের সব সময়েই বাজারে এই মাছের চাহিদা যথেষ্ট, বিক্রিও হয় বেশ চড়া দামে। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলের কাছেই মাগুর সহজপাচ্য, অতি সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও লোভনীয় মাছও বটে।

মাগুর মাছ কীটভোজী। গ্রামের অব্যবহার্য ডোবা, খানাখন্দ, এঁদো গর্তে মাগুর মাছের কিছু চারাপোনা ছেড়ে রাখলে এরা মশার ডিম খেয়ে নিয়ে ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। যে সব পুকুর বা জলাশয়ে পানিফলের চাষ হয় অথবা পানিফল জন্মানোর ফলে রুই, কাতলা জাতীয় মাছের চাষ সম্ভব হয় না সেই সব জলাশয়ে বাড়তি ফসল হিসাবে মাগুর মাছের চাষ করা যায়। অগভীর জলাশয়ে পাট পচানোর কাজ হয়ে যাওয়ার ১॥-২ মাস পরে কিছুটা চূন ব্যবহার করে ঐ সব জলাশয়ে মাগুর মাছের চারাপোনা

ছেড়ে লাভজনক চাষ করা যায়। মাগুর মাছ বায়ুমণ্ডলের বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত শারীরিক এই বিশেষ সুবিধা থাকায় যে কোন নোংরা জলেও, যেখানে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, মাগুর মাছের চাষ করা যায়।

ছোট আকারের অগভীর পুকুরই মাগুর মাছ চাষের পক্ষে উপযুক্ত। ৩ কাঠা থেকে এক বিঘা পর্যন্ত যে কোন আয়তনের পুকুরেই এই মাছের চাষ করা যায়। এইসব পুকুরে চৈত্র-বৈশাখ মাসে ১॥-২ ফুট গভীর জল থাকা চাই। এককভাবে অথবা রুই, কাতলা জাতীয় চাষোপযোগী মাছের সঙ্গে একই পুকুরে চাষ করা যায়। মিশ্র-মাছচাষে আমেরিকান রুই-এর পরিবর্তে মাগুরের চাষ করা অধিক লাভজনক। আঁতুড় পুকুর ও লালন পুকুর থেকে উৎপন্ন চারাপোনা সম্পূর্ণভাবে বিক্রি অথবা মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করার পর বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য ঐসব পুকুরে মাগুর মাছের চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। শীতের শুরুতে পুকুরে মাগুর মাছের চারাপোনা ছেড়ে চৈত্র মাসের শেষে অথবা বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পুকুর থেকে সব মাছই বিক্রয়যোগ্য অবস্থায় তুলে নেওয়া যায়। বর্ষাকালে মাগুর মাছের চাষ চলে না, কারণ, বৃষ্টির সঙ্গে এদের পুকুর থেকে উঠে পাশের ধানক্ষেত, জলাভূমি বা অন্যত্র চলে যাওয়ার আশংকা থাকে।

সাধারণত প্রতি কাঠা আয়তনের জলে গড়ে ১০ গ্রাম ওজনের ২৫০-৩০০টি মাগুর মাছের চারাপোনা ছাড়া যেতে পারে। নিয়মিত-ভাবে দৈনিক পুষ্টিকর কৃত্রিম খাদ্য খাইয়ে ৫-৬ মাসের চাষে ৭০-২০০ গ্রাম ওজনের বিক্রয়-উপযোগী মাছ উৎপন্ন করা যায়। যোগান দেওয়া খাদ্যের গুণাগুণের তারতম্যে উৎপন্ন মাছের ওজনেও বিরাট তারতম্য ঘটে।

মাগুর মাছ চাষের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো বাইরে থেকে যোগান দিয়ে মাছকে প্রচুর খাদ্য খাওয়ানো। বস্তুত মাগুর মাছ চাষের খরচ বলতে এই খাদ্য যোগানের খরচকেই বোঝায়। খাদ্য হিসাবে

ব্যবহার করা যায় ফিস্‌মিল বা শুকনো মাছের গুঁড়ো, চালের কুঁড়ো, বাদাম ও সরষের খোল, রান্নাকরা চালের খুদ ইত্যাদি। ২ ভাগ ফিস্‌মিলের সঙ্গে ১ ভাগ চালের কুঁড়ো মিশিয়ে নিলে খরচ কিছুটা কম পড়ে। ১৫ দিন অন্তর পুকুরে খ্যাপলা জাল দিয়ে কিছু মাছ ধরে মাছের গড় ওজন দেখে নিয়ে মাছের বৃদ্ধির হার অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণও বাড়ানো দরকার। ৩ মাস চাষের পর খাদ্যে কুঁড়ো ও ফিস্‌মিলের অনুপাত ১ : ১ করা যেতে পারে। খাদ্য দিতে হয় দিনে দু'বার।

মাগুর মাছ রাতেই খাদ্য ভালভাবে খায়। তাই সকালে খাদ্যের সিকিভাগ ও সন্ধ্যের পর অবশিষ্ট পঁচাত্তর ভাগ খাদ্য দিতে হয়। খাদ্য দেওয়া দরকার মজুত মাছের ওজনের (মোট) শতকরা ৫-৬ ভাগ হিসাবে। খাদ্যবস্তু পুকুরের নির্দিষ্ট কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে অথবা পুকুরের চারকোণে অল্প জলে জমা করে অথবা প্লাষ্টিক বালতি বা ট্রেতে দিয়ে জলের মধ্যে কিছুটা ঝুলিয়েও দেওয়া যায়। যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন লক্ষ্য রাখা দরকার যেন সম্পূর্ণ পরিমাণ খাদ্যের সদ্ব্যবহার হয়। এইজন্য শুকনো খাদ্য-বস্তু খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হলো হাতের মুঠো করে আস্তে আস্তে খাদ্যবস্তু ছড়িয়ে দেওয়া। একমুঠো খাওয়া শেষ হলে আর একমুঠো।— যতক্ষণ পর্যন্ত বেশীর ভাগ মাছ খাওয়া বন্ধ না করে।

যদিও ফিস্‌মিলে মাছ সবচেয়ে বেশী বাড়ে, ফিস্‌মিল ব্যবহার বেশ ব্যয়বহুল। সর্বত্র, বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে সহজলভ্যও নয়। তাই বিকল্প খাদ্য হিসাবে কাঁচা গোবর, চালের কুঁড়ো, বাদাম খোল ও সরষের খোল ভালভাবে মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি ১০০ কেজি খাদ্যবস্তু তৈরীর জন্য প্রয়োজন হয় ৬০ কেজি গোবর, ২০ কেজি চালের কুঁড়ো ও অপর দু'টি উপাদানের প্রতিটি ১০ কেজি হিসাবে। এই জাতীয় খাদ্যবস্তু অবশ্যই পুকুরের চারকোণে অল্প জলে স্তূপাকারে দিতে হবে যাতে মাছ সরাসরি ও সম্পূর্ণভাবে খাদ্য খেয়ে নিতে পারে এবং খাদ্যের অপচয় রোধ করা

যায়। ছড়িয়ে দেওয়া হলে খাদ্যবস্তুর অনেকটা অংশই জলে গুলে যায় এবং পুকুরের তলদেশে জমা হয়। এর ফলে একদিকে যেমন খাদ্যের অপচয় ঘটে অপরদিকে তেমনি জলের রাসায়নিক অবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, বিশেষ করে জলের পি. এইচ্-এর মান উল্লেখ-যোগ্যভাবে কমে যেতে পারে। পুকুরে এককভাবে মাগুর মাছের চাষ করা হলে জলের এইপ্রকার রাসায়নিক অবস্থায় শংকিত হওয়ার কারণ না ঘটলেও রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছের সঙ্গে মাগুর মাছের মিশ্র-চাষে জলের পি. এইচ-এর মানের উল্লেখযোগ্য হ্রাসে মাগুর ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির মাছের (রুই, কাতলা ইত্যাদি) বৃদ্ধি প্রচণ্ড-ভাবে ব্যাহত হয় এবং ঐ জাতীয় মাছের রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ারও আশংকা থাকে।

মাগুর মাছ কাঁচা গোবর খুব ভাল খায়। তাই মাগুর মাছের খাদ্য হিসাবে ফিস্‌মিল ও চালের কুঁড়ো ব্যবহার করা হলে মাঝে মাঝে পুকুরের চারকোণে গোবর স্তূপাকারে দিলে মাগুর মাছ তা সরাসরি খেয়ে নেয় এবং এর ফলে মাছের বৃদ্ধির হার দ্রুততর হয়। মাসে ১০ দিন প্রতিদিন বিঘা প্রতি জলকরে ১০০-১৫০ কেজি গোবর দেওয়া যেতে পারে। তবে এই ধরনের নিবিড় চাষে মাঝে মাঝে পুকুরে অল্প পরিমাণে (মাসে বিঘা প্রতি ৮-১০ কেজি) চূন ও বাইরে থেকে নতুন জল (পাম্পের সাহায্যে) দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে তা অবশ্যই মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের সহায়ক হয়।

মাগুর মাছচাষের পুকুর সাধারণত আয়তনে ছোট ও অগভীর হওয়ার ফলে মাছ ধরার ব্যাপারে বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দেয় না। টানাজালেই পুকুরের অধিকাংশ মাছ ধরে নেওয়া যায়। তবে বেশ কয়েকবার টানাজাল ব্যবহারের পর সাধারণত ঐ জালে আর মাছ আসে না। এই অবস্থায় খ্যাপলা জাল ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। এরপরেও পুকুরে যদি আরও কিছু মাছ থেকে যায় তবে সেক্ষেত্রে পাম্পের সাহায্যে পুকুরের জল শুকিয়ে ফেলে অবশিষ্ট মাছ ধরে নিতে হয়। এতে একটা বাড়তি সুবিধাও পাওয়া যায়। শুকিয়ে যাওয়ায়

পর ঐ অবস্থায় কিছুদিন পতিত পড়ে থাকলে তলদেশের মাটি সূর্যের কিরণে সংশোধিত হওয়ার ফলে পুকুরের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিপায়। প্রয়োজনীয় মাত্রায় চূন ও সার প্রয়োগ করে ঐ পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের ডিমপোনার চাষ করা হলে ধানিপোনা ও চারাপোনা উৎপাদনের হার খুব ভাল হয়।

মাগুর মাছের চাষ সহজসাধ্য ও যথেষ্ট লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও এই চাষের ব্যাপক প্রচলনের প্রধান ও সম্ভবত একমাত্র বাধা হলো চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজের সমস্যা। সারা পশ্চিমবাংলায় একমাত্র ২৪-পরগণা জেলার ক্যানিং, বসিরহাট, হাসনাবাদ অঞ্চল এবং বিশেষ করে ক্যানিং-এ মাছের বাজারে মাগুর মাছের চারাপোনা বিক্রির জন্য কয়েকটি আড়ৎ আছে। তাছাড়া আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির এমনকি সুদূর মাছ চাষীরাও ক্যানিং থেকে মাগুর মাছের চারাপোনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। এইভাবে এই মাছের বীজের চাহিদা প্রচুর, কিন্তু সেই তুলনায় যোগান খুবই অপ্রতুল। গত কয়েক বছর থেকে সরকারী উদ্যোগে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মাগুর মাছের বীজ কিছু কিছু পরিমাণে তৈরী করা হচ্ছে বটে, কিন্তু সেও প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। প্রজনন পদ্ধতি আরও সহজ ও ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনে এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ আছে।

মাগুর মাছের বীজ সংগ্রহের এই সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই মাছচাষীকে অগ্রসর হতে হবে এই মাছের চাষের কাজে। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ নিজেকেই তৈরী করে নিতে হবে। এবং তা করে নেওয়া খুব কঠিন কাজও নয়। যে কোন ধানক্ষেতের প্রাকৃতিক পরিবেশে মাগুর মাছের প্রজনন করানো যায়। ধানের চারা লাগানোর কাজ সমাপ্ত হলে ধানক্ষেতের চারদিকে ১-১।। ফুট উচ্চতার মাটির বাঁধ দিয়ে ক্ষেতে জল দিতে হয় পাম্পের সাহায্যে অথবা বৃষ্টির জল জমার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ইতিমধ্যে বাঁধ বরাবর ক্ষেতের ভেতরের দিকে কিছুটা গভীর অথচ অপরিসর কয়েকটি খাদ তৈরী করে দিতে হয় মাটি তুলে, যেগুলি মাগুর মাছ

বাসা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। ৮-১০ দিন পর ধানের চারা বেশ শক্তভাবে মাটিতে লেগে গিয়ে সতেজ হয়ে ওঠার পর প্রজননক্ষম সুপরিণত স্ত্রী ও পুরুষ মাছ ধানক্ষেতে ছাড়তে হয়। ডিমভর্তি ফোলা পেট ও গোলাকার প্রজনন গুটি দেখে স্ত্রী মাগুর মাছ নির্বাচন করতে হয়, আর সুপরিণত পুরুষ মাছ চেনা যায় অস্ফীত পেট এবং লালচে ও ছুঁচলো প্রজনন গুটি দেখে। প্রতি ৩০-৩৫ বর্গফুট আয়তনের জন্য একসেট মাছ ছাড়া বিধেয়। প্রতি সেটে নিতে হয় ১টি স্ত্রী মাছ ও ২টি পুরুষ মাছ। প্রজনন কাজে সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি মাছকে যে কোন প্রজাতির পরিণত মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি ইনজেকশন করা হয় মাত্র একবারই। মাছের দেহের প্রতি এক কেজি ওজনের জন্য ৪০ মিলিগ্রাম পরিমাণ গ্রন্থি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ইনজেকশন দেওয়ার পর রাত ১২টা নাগাদ মাছ ছাড়তে হয় ধানক্ষেতে। মাছ ছাড়ার পর সম্ভব হলে পাম্পের সাহায্যে ক্ষেতে কিছু পরিমাণ নতুন জল দিতে পারলে প্রজননের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়। মাছ ছাড়ার পর প্রায় ২০ ঘণ্টার মধ্যে প্রজনন ক্রিয়া ও ডিম ছাড়ার কাজ সমাপ্ত হয়। মাগুরের ডিমের রং হলদে। নিষিক্ত ডিম থেকে ডিমপোনা বেরিয়ে আসতে সময় লাগে প্রায় আরও ২৪ ঘণ্টা।

৭-৮ দিন পর কাপড় ছাঁকা দিয়ে ডিমপোনা ধরে নিয়ে ছোট পুকুরে ছাড়া যায় চারাপোনা তৈরীর জন্য। এই সময় সরষের খোল বা ফিস্‌মিল অথবা এই দুই-এর সংমিশ্রণ খুব ভালভাবে গুঁড়িয়ে মিহি অবস্থায় এবং প্রয়োজন কাপড়ের ওপর ছেলে নিয়ে ডিম-পোনাকে দৈনিক খাওয়াতে হয়। ৩০-৪০ দিনের মধ্যে চারা-পোনা ৩/৪-১ ইঞ্চি আকার প্রাপ্ত হয়। তবে ধানক্ষেত থেকে ডিমপোনা ধরার অসুবিধা দেখা গেলে ওখানেই ওদের বাড়তে দিতে হবে পুকুরে মাছচাষের মত নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দিয়ে। তারপর চারাপোনা কিছুটা বড় হলে ক্ষেতের ঢালের দিকের বাঁধ অল্প পরিসরে কেটে ও খোলামুখে চটজাল বসিয়ে চারাপোনা

ধরে নিয়ে পুকুরে ছাড়া যায়। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনে ধানকাটা শেষ হওয়ার পরেও একই পদ্ধতিতে ধানক্ষেত থেকে চারাপোনা ধরে নেওয়া যায়।

সারাংশ

মিষ্টি জলের যে কোন পুকুরে, এমনকী নোংরা জলেও মাগুর মাছের চাষ করা যায়। তবে আয়তনে ছোট ও অগভীর পুকুরই মাগুর মাছের চাষে উপযুক্ত। মাগুর মাছের চাষে পুকুর সংস্কারের, পুকুরে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। বাইরে থেকে কৃত্রিম খাদ্যের যোগান দিয়েই মাগুর মাছের চাষ করা যায়।

খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় ফিস্‌মিল বা শুকনো মাছের গুঁড়ো, চালের কুঁড়ো, সরষে ও বাদাম খোল, রান্নাকরা চালের খুদ ইত্যাদি। ফিস্‌মিল ব্যবহারে মাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী হলেও, এর ব্যবহার খুবই ব্যয়বহুল। তাই বিকল্প খাদ্য হিসাবে কাঁচা গোবর (৬০ ভাগ), চালের কুঁড়ো (২০ ভাগ), বাদাম খোল (১০ ভাগ) ও সরষের খোল (১০ ভাগ) ভাল-ভাবে মিশিয়ে নিয়ে পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু তৈরী করে ব্যবহার করা যায়। খাদ্য দিতে হয় সকালে সিকিভাগ ও সন্ধ্যের পর অবশিষ্ট পঁচাত্তরভাগ। দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ হবে মজুত মাছের মোট ওজনের শতকরা ৫-৬ ভাগ। ১৫ দিন অন্তর খ্যাপলা জাল দিয়ে কিছু সংখ্যক মাছ ধরে গড় ওজন জেনে নিয়ে মাছের বৃদ্ধির হার মোতাবেক খাদ্যের পরিমাণও বাড়ানো দরকার।

মাগুর মাছ চাষের প্রসারে প্রধান বাধা হলো মাছের বীজ সংগ্রহের সমস্যা। পশ্চিমবাংলার একমাত্র ২৪-পরগণা জেলার ক্যানিং, বসিরহাট ও হাসনাবাদ অঞ্চলে মাগুর মাছের চারাপোনা কিনতে পাওয়া যায়। তাও চাহিদার তুলনায়

অতি নগণ্য পরিমাণে। সরকারী উদ্যোগে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদনও অনিশ্চিত ও অপ্রতুল। এ বিষয়ে আরও গবেষণা, আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে। তবে গ্রামাঞ্চলে ধানক্ষেতের প্রাকৃতিক পরিবেশে অল্প আয়াসেই মাগুর মাছের প্রজনন করানো এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ডিমপোনা ও চারাপোনা উৎপাদন করে নেওয়া সম্ভব।

আঁতুর পুকুর ও লালন পুকুর থেকে রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদির চারাপোনা সম্পূর্ণভাবে তুলে নিয়ে বিক্রি অথবা স্থানান্তরিত করার পর বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য এইসব পুকুরে মাগুর মাছের চাষ করে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। মিশ্র-মাছচাষেও আমেরিকান রুই-এর পরিবর্তে মাগুর মাছের চারাপোনা ছেড়ে এবং নীচের স্তরের মৃগেল মাছের চারাপোনা সংখ্যায় কিছুটা কম করে অধিক ফলন লাভ করা যায়।

মিষ্টি জলে গলদা চিংড়ির চাষ

বিভিন্ন জাতের চিংড়ির মধ্যে গলদা চিংড়ি সবচেয়ে বেশী সুস্বাদু। শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষের কাছে চিংড়ি একটি লোভনীয় খাদ্যবস্তু। তাই বিদেশে রপ্তানী করে এই থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। এর চাহিদা অপরিসীম, তুলনায় উৎপাদন ও যোগান অতি নগণ্য। গলদা চিংড়ির অন্যান্য বিশেষ গুণ হল, এরা শান্ত জাতের চিংড়ি, দেহের ওজন দ্রুত বাড়ে, লার্ভা-জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং বাজারে আসামাত্র অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি হয়ে যায়। গলদা চিংড়ির জনপ্রিয়তা এত বেশী যে বিদেশের বাজার দূরে থাক, নিজের দেশের শতকরা ৫০ ভাগ চাহিদা মেটাতে হলেও উৎপাদন বাড়াতে হবে বর্তমানের তুলনায় কয়েকশ' গুণ।

এত চাহিদা, বাজারে এত বেশী দাম থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে গলদা চিংড়ির চাষ যে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে পারে নি তার কারণ হলো ঃ

১। গলদা চিংড়ির বীজ সর্বত্র সহজে মেলে না, মাত্র কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় পাওয়া যায় যেমন, বসিরহাট অঞ্চলে, মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে এবং ঐ জেলার সবং থানায় কেলেঘাই নদীতে, নদীয়া জেলার শিমূরালী অঞ্চলে, আড়ংঘাটার চূর্ণী নদীতে ও মাজদিয়া-বাণপুর অঞ্চলে ইচ্ছমতী নদীতে, হাওড়া জেলার উলবেড়িয়া ও আমতা অঞ্চলে। অন্যান্য আর কিছু এলাকায় যা পাওয়া যায় তা পরিমাণের দিক থেকে মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

২। বীজ সরবরাহের কোন সংঘবদ্ধ বাজার বা সংগঠন নেই।

৩। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বীজ পরিবহনের সমস্যা সমাধানের সঠিক পন্থা এখনও অনধিকৃত। প্রায় ক্ষেত্রেই পরিবহন কালে পথে বীজ সমূলে মারা যায়।

৪। আমাদের দেশের জলহাওয়া এবং প্রধান প্রধান দেশী মাছের চাষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গলদা চিংড়ি চাষের পদ্ধতি ও প্রকরণ কী হলে সামগ্রিক ভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা মাছ চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান সম্ভব হতে পারে সেই সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যানের যথেষ্ট অভাব।

স্বভাবতই মিষ্টি জলে গলদা চিংড়ি চাষের সম্প্রাসরণের স্বার্থে এই-সব সমস্যাগুলির সুষ্ঠ সমাধান হওয়া দরকার। আর, এরজন্য দরকার সরকারী উদ্যোগে সুসংহত পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাতে কৃত্রিম প্রজনন থেকে শুরু করে বড় আকারের রপ্তানীযোগ্য গলদা চিংড়ি উৎপাদন করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রকরণ, খাদ্য, পরিচর্যা, পরিচালনা ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব বিষয়ে সঠিক মাত্রা ও পন্থা নির্ধারণ করা যায় এবং গবেষণালব্ধ সেইসব ফলাফল মাছচাষীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। গলদা চিংড়ি চাষের এই সীমবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এককভাবে না হলেও চাষোপযোগী বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সঙ্গে গলদা চিংড়ির মিশ্র-চাষ অনেকদিন আগে থেকেই চলে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইসব চাষের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কিছু কিছু পরীক্ষিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই মাছচাষীকে অগ্রসর হতে হবে গলদা চিংড়ির চাষে।

খোলামেলা জায়গায় অবস্থিত পাঁকবিহীন অথবা অল্প পাঁকযুক্ত, খুব বেশী গভীর নয় (তিন থেকে পাঁচ ফুট), পর্যাপ্ত দ্রবীভূত অক্সিজেনে সমৃদ্ধ মিষ্টি জলের যে কোন আয়তনের পুকুরে গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়। সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র মাস থেকেই নদীতে গলদা চিংড়ির ডিমপোনা পাওয়া যায়। তবে ডিমপোনা ও খুব ছোট চারাপোনা অবস্থায় এদের চিনে নেওয়া শক্ত। একটু বড় আকারের (এক থেকে দেড় ইঞ্চি) হলে চিনতে অসুবিধা হয় না। ডিমপোনার চাষ করতে হলে ছোট আয়তনের আঁতুড় পুকুর তৈরী করে নিতে হবে রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছের ডিমপোনা চাষের আঁতুড় পুকুরের মতো। চারাপোনা চাষের ক্ষেত্রেও ডিমপোনা চাষের মতো

পুকুর অবশ্যই মৎস্যভূক মাছ এবং সাপ, ব্যাঙ, পোকামাকড় ইত্যাদি ক্ষতিকর জীব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া দরকার।

পুকুরে সৃষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপরই প্রধানত নির্ভরশীল হলেও গলদা চিংড়ি দ্রুত বৃদ্ধির জন্য এদের নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর পরিপূরক খাদ্য খাওয়ানোর দরকার হয়। মিশ্র-মাছের চাষের ক্ষেত্রে (মৃগেল ও/বা আমেরিকান রুই-এর সংখ্যা কমিয়ে চিংড়ির চাষে) পুকুরে মজুত বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য যে খাদ্য (সাধারণত সরষের খোলের গুঁড়ো ও চালের কুঁড়ো) দেওয়া হয় তার পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে চিংড়িকে খাওয়াতে হয় দৈনিক—মজুত চিংড়ির মোট ওজনের শতকরা ৪-৫ ভাগ হিসাবে। প্রতি মাসে ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি করা দরকার। তবে চিংড়ির জন্য বরাদ্দ খাদ্য দিতে হয় পুকুরের অন্যান্য মাছকে খাওয়ানোর পরে এবং অবশ্যই মণ্ডাকারে পুকুরের বকচরে অথবা বকচরের অভাবে পুকুরের তলদেশের মাটিতে। গলদা চিংড়ির একক চাষেও একই পদ্ধতিতে চিংড়িকে পরিপূরক খাদ্য খাওয়াতে হয়।

জল দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘাটতি গলদা চিংড়ির চাষ-চক্রে এক মারাত্মক সমস্যা, বিশেষ করে শীতকালে কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে। এই সময় পুকুরের যাবতীয় চিংড়ি পাড়ের দিকে জলে কিনারায় এসে জমা হয় অক্সিজেনের সন্ধানে। এই অবস্থায় অনেক চিংড়ি মারা পড়ে, বহু সংখ্যক যায় শেয়াল-কুকুরের পেটে, আবার সেইসঙ্গে চুরিও হয় অনেক পরিমাণে। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে ফসল তুলে নিয়ে বিক্রি করা হলে সম্ভাব্য এই জাতীয় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়। এরজন্য দরকার অন্তত জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতেই গলদা চিংড়ির চারা পুকুরে মজুত করা যাতে কমপক্ষে ৬ মাসকাল চাষ করে বিক্রয়যোগ্য আকার ও ওজনের গলদা চিংড়ি উৎপাদন করা যায়।

প্রচলিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছ'জাতীয় মাছের মিশ্র-চাষে পুকুরে ছাড়া আমেরিকান রুই ও মৃগেলের চারাপোনার

সংখ্যা কিছুটা কম করে (সিকিভাগ পরিমাণ) তার পরিবর্তে গলদা চিংড়ির চারা ছাড়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন একটি বাড়তি ফসল পাওয়া যায় তেমনি আবার গলদা চিংড়ির বাজারদর অন্য যে কোনো চাষোপযোগী মাছের তুলনায় বেশী হওয়ায় মাছচাষে আয়ের দিক থেকেও অধিক লাভবান হওয়া যায়। দেখা গেছে, এই ধরনের চাষে বিঘা প্রতি জলকরে ১৬০০-২০০০ সংখ্যক গলদার চারা (২-২॥ ইঞ্চি সাইজের—আরও বড় সাইজের গলদার চারা জীবন্ত অবস্থায় পরিবহনের অযোগ্য) ছাড়া যেতে পারে। ছ'জাতীয় মাছের পরিবর্তে কেবলমাত্র রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের সঙ্গেও একই পুকুরে গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়। যে প্রজাতিরই মাছের সঙ্গে গলদা চিংড়ির মিশ্র-চাষ করা হোক না কেন বৈশাখ মাসের শেষের দিকে বা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুতে পুকুরে গলদা চিংড়ির চারা ছেড়ে অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে বিক্রি করার জন্য পুকুরে থেকে চিংড়ি তুলে দিলে কম-বেশী এই ৭ মাসের চাষে ছাড়া চারার শতকরা ৭৫টি হিসাবে গড়ে প্রতিটি ৫০ গ্রাম ওজনের গলদা চিংড়ির উৎপাদন আশা করা যায়।

সম্পূর্ণ একবছর বা আরও বেশী সময়ের মেয়াদে মিষ্টি জলের পুকুরে এককভাবে গলদা চিংড়ি চাষের নির্ভরশীল তথ্য না থাকলেও গত কয়েক বছর থেকে গ্রামাঞ্চলে অনেকে স্বল্পকালের মেয়াদে চিংড়ির একক-চাষ প্রচলন করেছেন, গলদা চিংড়ির ক্রমবর্ধমান অতি লোভনীয় দামের আকর্ষণে। বিশেষভাবে যে সব অঞ্চলে অল্প দূরত্বের মধ্যে এবং অল্প আয়াসে গলদা চিংড়ির চারা সংগ্রহ করা সম্ভব সেই-সব অঞ্চলেই এই ধরনের চাষের প্রচলন কিছুটা উল্লেখযোগ্য। মহুয়া খোল, চুন, গোবর ইত্যাদি ব্যবহার করে পুকুরে গলদা চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরী করে নেওয়া হয়। খাদ্যের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য প্রতি মাসেই পুকুরে সার (সরষের খোল) প্রয়োগ করা হয় বিঘা প্রতি জলকরে ২০ কেজি হিসাবে। গোবর ব্যবহার করা হয় একবারই, পুকুর তৈরী করার সময় বিঘা প্রতি ২০০ কেজি হিসাবে।

চূন পুকুর তৈরীর সময় বিঘা প্রতি ৩০-৪০ কেজি হিসাবে, এর পরে প্রতি মাসে ১০ কেজি হিসাবে। গলদা চিংড়ির চারা ছাড়া হয় বিঘা প্রতি জলকরে ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার (দেড় ইঞ্চি থেকে দু'ইঞ্চি সাইজের)। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় সরষের খোলের গুঁড়ো ও চালের কুঁড়ো পুকুরে গলদা চিংড়ির মোট ওজনের শতকরা ৪-৫ ভাগ হিসাবে। বৈশাখ মাসের শেষদিকে অথবা জ্যৈষ্ঠের শুরুতেই পুকুরে চিংড়ির চারা ছেড়ে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকেই ফসল তুলে বিক্রি করা হলে কম-বেশী ৬ মাসের চাষে ছাড়া চারার শতকরা ৭৫টি হিসাবে গড়ে প্রতিটি ৪০ গ্রাম ওজনের গলদা চিংড়ির উৎপাদন আশা করা যায়। খাদ্যের মান উন্নয়ন, আরও বেশী মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ, সস্তা বিকল্প সার গোবরের নিয়মিত প্রয়োগ, দৈনিক কয়েক ঘণ্টা পুকুরে জলস্রোতের ব্যবস্থা, অক্সিজেন-অভাবজনিত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলির দিকে আরও বেশী নজর দিতে পারলে গলদা চিংড়ির আরও অধিক ফলন অবশ্যই আশা করা যায়। গলদা চিংড়ি তুলে নেওয়ার পরপরই ঐ একই পুকুরে মাগুর মাছের চারা ছেড়ে বছরে ১২ মাসের অবশিষ্ট ৫ মাস মাগুর মাছের লাভজনক চাষ করা যায়। এই বিশেষ ধরনের চাষে (প্রথমে গলদা চিংড়ি ও পরে মাগুর মাছ) লাভের পরিমাণ খুবই আকর্ষণীয় এবং চাষকালীন ক্ষয়ক্ষতি ও ঝুঁকি অন্যান্য ধরনের মাছ চাষের তুলনায় খুবই কম।

গলদা চিংড়ির জীবন-চক্রে আর একটা বিপদ দেখা দেয় খোলা বদলের সময়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত বড় আকারের চিংড়ির ক্ষেত্রেই এটা ঘটে। খোলা পরিত্যাগ করা ও নতুন খোলা হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে এরা অনেকটা নিস্তেজ অবস্থায় পুকুরের তলদেশে মাটিতে পড়ে থাকে। খোলাবিহীন অবস্থায় পাঁকমাটির সংস্পর্শে এসে এদের যেমন নানা বীজাণু দ্বারা রোগাক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট আশংকা থাকে, তেমনি আবার পুকুরের বিভিন্ন ধরনের মাছ ও পোকামাকড় এই অসহায় অবস্থায় এদের দৈহিক ক্ষতিসাধনেরও

চেষ্টা করো। তালপাতা বা খেজুরপাতা পুকুরের তলদেশে ও বকচরে বিছিয়ে রাখলে এরা সেখানে আশ্রয় নিয়ে বিপদ থেকে নিজেদের অনেকটা রক্ষা করতে পারে।

টানাজালে গলদা চিংড়ি ভালভাবে ধরা যায় না। খ্যাপলা বা ঝাঁকি জাল দিয়েই গলদা চিংড়ি ধরতে হয়। ধরার পর বাঁশের ঝুড়ির মধ্যে রেখে জলজ উদ্ভিদ হালকাভাবে চাপা দিয়ে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে ভিজে ও ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখতে পারলে পরের দিন সকালে গলদা চিংড়ি বেশ টাটকা অবস্থায় বাজারে পাঠানো যায়।

সারাংশ

বিভিন্ন জাতের চিংড়ির মধ্যে গলদা চিংড়িই সবচেয়ে বেশী সুস্বাদু। বাজারে আসামাত্র বিক্রি হয়ে যায় চড়া দামে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গলদা চিংড়ির চাহিদা প্রচুর। তাই বিদেশে রপ্তানী করে গলদা চিংড়ি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

এত চাহিদা ও দাম সত্ত্বেও আমাদের দেশে মিষ্টি জলের পুকুরে গলদা চিংড়ির চাষ যে এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করে নি তার প্রধান কারণ হলো গলদা চিংড়ির বীজের দুষ্প্রাপ্যতা ও অপ্রতুলতা। বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধেও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যানের যথেষ্ট অভাব।

এককভাবে চাষের পদ্ধতি, প্রকরণ, পরিচালন ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাব ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্ভরশীল তথ্য না থাকলেও মজুত পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সঙ্গে গলদা চিংড়ির মিশ্র-চাষ এবং স্বল্পকালীন মেয়াদে গলদা চিংড়ির একক-চাষ আজ কয়েক বছর হলো কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছে। খোলামেলা জায়গায় অবস্থিত পাঁকবিহীন বা অল্প পাঁকযুক্ত, খুব বেশী গভীর নয় এমন যে কোনো আয়তনের মিষ্টি জলের পুকুরে গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়।

মিশ্র-মাছের চাষে বিঘা প্রতি জলকরে ১৬০০-২০০০ সংখ্যক (১-১॥ ইঞ্চি) এবং একক-চাষে ৮-১০ হাজার সংখ্যক (১॥-২ ইঞ্চি) গলদা চিংড়ির চারা ছাড়া যায়। পুকুরে সৃষ্ট প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হলেও গলদা চিংড়িকে প্রতিদিন পরিপূরক খাদ্য খাওয়াতে হয়, চিংড়ির মোট ওজনের শতকরা ৪-৫ ভাগ হিসাবে।

চাষের পুকুরের জলে অক্সিজেনের ঘাটতি গলদা চিংড়ির পক্ষে খুবই মারাত্মক। এই কারণে বিশেষ করে শীতকালে কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে গলদা চিংড়ির সমূহ বিপদ দেখা দেয়। এই অবস্থায় বহু সংখ্যক চিংড়ি মারা পড়ে, অন্যভাবেও চাষে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে পুকুর থেকে তুলে ফসল বিক্রি করে দিলে এই জাতীয় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়। এরজন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমদিকেই পুকুরে গলদা চিংড়ির চারা ছাড়া দরকার যাতে অন্তত ৬ মাসকাল পুকুরে চিংড়ির চাষ করা যায়। এককভাবে এই ৬ মাসের চাষে গড়ে ৪০ গ্রাম ওজনের বিক্রয়োপযোগী গলদা চিংড়ি উৎপাদন করা যায়। অন্যান্য মাছের সঙ্গে মিশ্র-চাষে কম-বেশী ৭ মাসের চাষে গড়ে ৫০ গ্রাম গলদা চিংড়ির উৎপাদন আশা করা যায়। পরিপূরক খাদ্যের মান উন্নয়ন, চিংড়িকে আরও বেশী পরিমাণে খাদ্য খাওয়ানো, জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ঘাটতিজনিত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলির দিকে আরও নজর দিয়ে অন্তত একবছরের মেয়াদে গলদা চিংড়ির একক-চাষ করতে পারলে আরও অধিক ফলন এবং আশাতীত আয়ের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা সম্ভব। স্বল্পকালের মেয়াদে চাষের পরপরই একই পুকুরে মাগুর মাছের চাষ করা হলে সারা বছরের হিসাবে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় খুবই আকর্ষণীয় এবং এই বিশেষ ধরনের চাষে (প্রথমে গলদা চিংড়ি ও পরে মাগুর মাছের চাষ) চাষকালীন ক্ষয়ক্ষতিও অন্যান্য যে কোনো ধরনের মাছচাষের তুলনায় অনেক কম।

বিভিন্ন ধরণের মাছচাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব

আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনার চাষ ঃ

এক নজরে চাষের বিবরণ ঃ

ক) ইউনিট এলাকা ঃ ৫ কাঠা বা ০·০৩ হেক্টর

খ) জলের গভীরতা (গড়) ঃ ৩ ফুট বা মোটামুটি ১ মিটার

গ) মহুয়া খোলের পরিমাণ ঃ ৭৫ কেজি (কেবলমাত্র প্রথমবার ডিমপোনা ছাড়ার আগে পুকুর তৈরীর জন্য)

ঘ) চাষে ব্যবহৃত ডিমপোনার বিভিন্ন প্রজাতি ঃ রুই, কাতলা ও মৃগেল

ঙ) ডিমপোনা সংগ্রহের উৎস ঃ প্রণোদিত প্রজনন প্রক্রিয়ায় সরকারী বা বেসরকারী বা নিজস্ব খামারে উৎপাদিত বীজ

চ) পুকুরে ডিমপোনা ছাড়ার সংখ্যা ঃ

১ম বার·········১ লক্ষ

২য় বার·········৬০ হাজার (১ম বারের ৬০%)

৩য় বার ····· ৫০ হাজার (১ম বারের ৫০%)

৪র্থ বার ·········৪০ হাজার (১ম বারের ৪০ %)

মোট·········· ২ লক্ষ ৫০ হাজার

ছ) চুন প্রয়োগের পরিমাণ ঃ প্রথমবার, ডিমপোনা ছাড়ার আগে পুকুর তৈরীর সময় ১০ কেজি এবং পরে প্রতিবার ফসল তোলার পর ও ডিমপোনা ছাড়ার আগে ২ কেজি হিসাবে তিনবারে ৬ কেজি, অর্থাৎ মোট ১৬ কেজি

জ) সার প্রয়োগের পরিমাণ :

কাঁচা গোবর—প্রথমবার পুকুর তৈরীর সময় ১০০ কেজি এবং পরে প্রতিবার ফসল তোলার পর ও ডিমপোনা ছাড়ার আগে ৫০ কেজি হিসাবে তিনবারে ১৫০ কেজি, অর্থাৎ মোট ২৫০ কেজি

সরষের খোল—ডিমপোনা ছাড়ার দিন ৪ কেজি হিসাবে এবং ছাড়ার ৬-৭ দিন পর চাষকালীন অবস্থায় ৩-৪ দিন অন্তর ৪ কেজি হিসাবে, অর্থাৎ, প্রতিবার চাযে ১২ কেজি হিসাবে চারবারে মোট ৪৮ কেজি

ঝ) কেরোসিন তেলের পরিমাণ : প্রতিবার ডিমপোনা ছাড়ার আগে ৭ লিটার হিসাবে চারবারে মোট ২৮ লিটার

ঞ) পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্যের (১ : ১ অনুপাতে মিশ্রিত চালের কুঁড়ো ও সরষের খোল) পরিমাণ :

পুকুরে মজুত-করা ডিমপোনার সংখ্যা তথা ওজন অনুযায়ী দেয় চারবারের চাষে মোট ৫০ কেজি

ট) ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনার (২-৩ সেমি) উৎপাদন :

১ম বার……৭০ হাজার (৭০%)
২য় বার ……৩৫ হাজার (৬০%)
৩য় বার …… ২৫ হাজার (৫০%)
৪র্থ বার ……২০ হাজার (৫০%)
মোট ……১ লক্ষ ৫০ হাজার (৬০%)

ঠ) উৎপন্ন ফসলের বিলি-বন্দোবস্ত :

উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশ সংখ্যক (এক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৪০ হাজার) ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনা বিক্রি করে দেওয়া অথবা লালনপুকুরে স্থানান্তরিত করার পর পুকুরে

অবশিষ্ট মোটামুটি ১০ হাজার সংখ্যক ছোট চারা-পোনার চাষ করা—অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের চারাপোনা ও পরিশেষে বিক্রয়োপযোগী মারমাছ বা খাওয়ার মাছ উৎপাদনের জন্য তথা সারা বছর আঁতুড় পুকুরের সদ্ব্যবহারের জন্য।

প্রণোদিত প্রজননের সুবাদে আজকাল বর্ষার অনেক আগেই, বস্তুত বৈশাখ মাসের প্রথমদিকেই পুকুরে ছাড়ার জন্য ডিমপোনা কিনতে পাওয়া যায়। আঁতুড় পুকুরে চাষোপযোগী জল থাকলে কিংবা বাইরে থেকে পুকুড়ে জল ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে পারলে (গভীর অথবা অগভীর নলকূপ থেকে) প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ চারবার ডিমপোনার চাষ এবং উৎপন্ন ডিমপোনা ও ছোট চারাপোনার (২-৩ সেমি) বিলি-বন্দোবস্তের কাজ, খুব বেশী দেরী হলেও, ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে অবশ্যই শেষ করা যায় এবং এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ ছোট চারাপোনার চাষ করে অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের (৬-৭.৫ সেমি) চারাপোনা উৎপাদনের কাজ ধরা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে চাষের বিবরণ :

ক চুন প্রয়োগের পরিমাণ : একমাসের ব্যবধানে দুবারে ২ কেজি হিসাবে ৪ কেজি

খ) সার প্রয়োগ :

কাঁচা গোবর—এক মাসের ব্যবধানে ৫০ কেজি হিসাবে দুবারে ১০০ কেজি

সরষের খোল—১৫ দিন অন্তর ৪ কেজি হিসাবে চারবারে ১৬ কেজি

গ) পরিপূরক খাদ্য : পুকুরে মজুত চারাপোনার ওজন অনুযায়ী (ওজনের ৪-৫% হিসাবে) ৬০ কেজি

ঘ) উৎপাদন ঃ অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের (৬-৭·৫ সেমি) ৭০০০ সংখ্যক চারাপোনার উৎপাদন আশা করা যায়

ঙ) উৎপন্ন ফসলের বিলি-বন্দোবস্ত ঃ উৎপন্ন চারাপোনার অধিকাংশ (এক্ষেত্রে ৬ হাজার) বিক্রি অথবা অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করার পর অবশিষ্ট চারাপোনা (এক্ষেত্রে ১০০০টি) বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য (এক্ষেত্রে কম-বেশী ৫ মাসকাল) আঁতুড় পুকুরেই রেখে চাষ করা

তৃতীয় পর্যায়ে চাষের বিবরণ ঃ

ক) চুন প্রয়োগ ঃ প্রতি মাসে ২ কেজি হিসাবে ৫ মাসে ১০ কেজি

খ) সার প্রয়োগ ঃ

কাঁচা গোবর—প্রতি মাসে ৫০ কেজি হিসাবে ৫ মাসে মোট ২৫০ কেজি

সরষের খোল—১৫ দিন অন্তর ৪ কেজি হিসাবে ৫ মাসে মোট ৪০ কেজি

গ) পরিপূরক খাদ্য ঃ মজুত মাছের ওজন অনুযায়ী প্রতিদিন দেয় (মোট ওজনের ৪-৫%) ৫ মাসের জন্য মোট ৯০ কেজি

ঘ) উৎপাদন ঃ ৫ মাসের চাষে চাষকালীন ক্ষয়ক্ষতি (২৫%) বাদে মোট ৭৫০টি বিক্রয়োপযোগী (গড়ে প্রতিটি ৭৫ গ্রাম ওজনের) মাছ বা মোট ৫৬ কেজি ওজনের মাছ

ঙ) উৎপন্ন ফসলের বিলি-বন্দোবস্ত ঃ

যেসব পুকুরে সারা বছর চাষোপযোগী গভীরতায় জল থাকে সেইসব পুকুরের মাছচাষীদের মধ্যে অনেকে পুকুর থেকে বছরে দুবার অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের মারমাছ বা খাওয়ার মাছ তুলে বিক্রি করে অধিক লাভবান হওয়ার জন্য

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পুকুরের মাছ তুলে দিয়ে নতুন করে অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের (৫০-১০০ গ্রাম ওজনের) চালা-পোনা ছাড়েন আষাঢ়-শ্রাবণ পর্যন্ত চাষ করার জন্য। আঁতুড় পুকুরে উৎপন্ন চালাপোনা / মাছ (গড়ে প্রতিটি ৭৫ গ্রাম ওজনের) এইসব মাছচাষীদের কাছে জীবন্ত অবস্থায় বেশ চড়া দামে অথবা মারমাছ হিসাবে সরাসরি বাজারে বিক্রি করে দেওয়া যায়।

এইভাবে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আঁতুড় পুকুরের যাবতীয় মাছ তুলে নিয়ে পরের মরশুমের (বছরের) জন্য পুকুর তৈরীর কাজে হাত দেওয়া দরকার যাতে অন্তত বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ আঁতুড় পুকুরে আবার নতুন করে ডিমপোনা ছাড়া যায়।

ব্যয়ের হিসাব ঃ	টাকা
১) পুকুরের ভেতরের ও পাড়ের ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য জন-মজুরী	৫০
২) পুকুরের আমাছা ও মৎস্যভূক মাছ নির্মূল করার জন্য দেয় ৭৫ কেজি মহুয়া খোলের দাম—প্রতি কুইন্টাল ১০০ টাকা হিসাবে	৭৫
৩) তিন পর্যায়ে চাষে ব্যবহৃত মোট ৩০ কেজি চুনের দাম—প্রতি কুইন্টাল ৮০ টাকা হিসাবে	২৪
৪) সার দেওয়া বাবদ খরচ—	
ক) কাঁচা গোবর ৬০০ কেজির দাম— প্রতি কুইন্টাল ১০ টাকা হিসাবে	৬০
খ) সরষের খোল ১০৪ কেজির দাম— প্রতি কুইন্টাল ১৬০ টাকা হিসাবে	১৬৬
৫) ২৮ লিটার কেরোসিন তেলের দাম—প্রতি লিটার ২ টাঃ ৫০ পঃ হিসাবে	৭০

৬)	২ লক্ষ ৫০ হাজার ডিমপোনার দাম—প্রতি লক্ষ গড়ে ৩০০ টাকা হিসাবে	৭৫০
৭)	২০০ কেজি পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্যের দাম—প্রতি কুইন্টাল ১১০ টাকা হিসাবে	২২০
৮)	পুকুরে বিভিন্ন সময়ে জাল টানা বাবদ খরচ—জাল ভাড়া ও জন-মজুরী (জাল কিনে নেওয়া হলে শুধু জন-মজুরী বাবদই খরচ লাগবে এবং উপযুক্তভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে পরপর দু'বছর একই জাল ব্যবহার করা যাবে)	৭৫০
৯)	অন্যান্য বিবিধ খাতে খরচ, যথা বালতি, মগ, টর্চলাইট ইত্যাদি খরিদ বাবদ	১২৫
		মোট ২২৯০ টাকা

আয়ের হিসাব ঃ

		টাকা
১)	১ লক্ষ ৪০ হাজার ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনা (২-৩ সেমি) বিক্রি বাবদ—প্রতি ১০০০ পোনা ২৫ টাকা হিসাবে	৩৫০০
২)	৬০০০ চারাপোনা (৬-৭.৫ সেমি) ওজন ৩০ কেজি বিক্রি বাবদ—প্রতি হাজার চারাপোনা ৭৫ টাকা হিসাবে / প্রতি কেজি ১৫ টাকা হিসাবে	৪৫০
৩)	৫৬ কেজি মারমাছ বা খাওয়ার মাছ বিক্রি বাবদ—প্রতি কেজি ১৫ টাকা হিসাবে	৮৪০
		মোট ৪৭৯০ টাকা

উপরে বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী ৫ কাঠা আয়তনের আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনা চাষে বছরে লাভ দাঁড়ায় ২৫০০ টাকা, অর্থাৎ বিঘা প্রতি ১০ হাজার টাকা।

বিকল্প চাষ ঃ

আঁতুড় পুকুরে ডিমাপোনা ও ছোট চারাপোনার চাষের পর বছরের অবশিষ্ট সময়ে আঁতুড় পুকুরের সদ্ব্যবহারের জন্য রুই, কাতলা, মৃগেলের অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের চারাপোনা চাষের (মারমাছ বা খাওয়ার মাছ উৎপাদনের জন্য) বিকল্প হিসাবে মাগুর মাছের চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ে চাষের পর আঁতুড় পুকুরের যাবতীয় মাছ (চারাপোনা) তুলে বিক্রি করে দেওয়া দরকার।

আঁতুড় পুকুরে মাগুর মাছ চাষের বিবরণ ঃ

ক) পুকুরে ১৫০০টি মাগুর মাছের চারাপোনা (গড়ে প্রতিটি ১০ গ্রাম ওজনের) ছাড়া

খ) দিনে দু'বার – সকালে (২৫ ভাগ) ও সন্ধ্যায় (৭৫ ভাগ) —মাছকে কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো—কাঁচা গোবর (৬০ ভাগ), চালের কুঁড়ো (২০ ভাগ), বাদাম খোল (১০ ভাগ) ও সরষের খোল (১০ ভাগ) একত্রে ভালভাবে মিশিয়ে —মাছের মোট ওজনের শতকরা ৬ ভাগ হিসাবে

গ) মাসে অন্তত একবার এবং সম্ভব হলে ১৫ দিন অন্তর খ্যাপলা জাল ফেলে অথবা জাল টেনে কিছু সংখ্যক মাছ ধরে মাছের গড় ওজন নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী দেয় কৃত্রিম খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা

ঘ মাছের উৎপাদন ঃ

৫ মাসের চাষে পুকুরে ছাড়া চারাপোনার (১৫০০) শতকরা ৮০টি মাছ হিসাবে পাওয়ার এবং গড়ে প্রতিটি মাছ ৯০ গ্রাম ওজনের হওয়ার আশা করা যায়। এই হিসাব অনুযায়ী উৎপন্ন ফসলের মোট ওজন হবে ১০৮ কেজি

ঙ) উৎপন্ন ফসলের বিলি-বন্দোবস্ত ঃ

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পুকুরে উৎপন্ন যাবতীয় মাছ ধরে বিক্রি করে দেওয়া—জাল টেনে, খ্যাপলা জাল

ফেলে এবং প্রয়োজনে পাম্প দিয়ে জল তুলে পুকুর শুকিয়ে ফেলে। এরপরই পরবর্তী মরশুমে আঁতুড় পুকুরে আবার রুই, কাতলা, মৃগেলের ডিমপোনা চাষের জন্য আঁতুড় পুকুর তৈরীর কাজে হাত দেওয়া

ব্যয়ের হিসাব ঃ	টাকা
১) ১৫০০টি মাগুর মাছের চারাপোনা, গড়ে প্রতিটি ১০ গ্রাম ওজনের, মোট ১৫ কেজির দাম—প্রতি কেজি ২২ টাকা হিসাবে	৩৩০
২) মাছকে খাওয়ানোর জন্য কৃত্রিম খাদ্যের দাম—কাঁচা গোবর ৫৪০ কেজি, চালের কুঁড়ো ১৮০ কেজি, বাদাম খোল ৯০ কেজি ও সরষের খোল ৯০ কেজি—মোট ৯০০ কেজি	৪৮৫
৩) পুকুরে মাঝে মাঝে খ্যাপলা জাল দেওয়া এবং পরে মাছ ধরার জন্য টানাজাল ও খ্যাপলা জাল দেওয়ার দরুন জাল-ভাড়া ও জন-মজুরী বাবদ খরচ	১২৫
৪) অন্যান্য বিবিধ খাতে খরচ	৬০
মোট ব্যয় ঃ	১০০০ টাকা

আয়ের হিসাব ঃ	টাকা
১০৮ কেজি মাগুর মাছ বিক্রি বাবদ—প্রতি কেজি ২৫ টাকা হিসাবে	২৭০০
মোট আয়	২৭০০ টাকা

আয়-ব্যয়ের এই হিসাব অনুযায়ী ৫ কাঠা আয়তনের আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনা চাষের তৃতীয় পর্যায়ে বিকল্প চাষ হিসাবে মাগুর

মাছের চাষ করা হলে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭০০ টাকা বা বিঘা প্রতি ৬৮০০ টাকা এবং সারা বছরের হিসাবে এই লাভের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে (৫ কাঠা/বিঘা) ৩৭৫০ টাকা ও ১৫ হাজার টাকা (মোট আয় ৬৭২৫ টাকা থেকে মোট ব্যয় ২৯৭৫ টাকা বাদ দিয়ে —দ্বিতীয় পর্যায়ে উৎপন্ন ৭ হাজার চারাপোনা সম্পূর্ণ বিক্রি করার দরুন বাড়তি আয় ৭৫ টাকা হিসাবে ধরে এবং তৃতীয় পর্যায়ে রুই, কাতলা, মৃগেলের চারাপোনা চাষের খরচ আনুমানিক ৩১৫ টাকা মোট ব্যয় থেকে বাদ দিয়ে)। চাষের পুকুর নিজস্ব মালিকানাধীন না হয়ে লীজ বা বন্দোবস্ত নেওয়া হলে এবং পুকুরের খাজনা বাবদ বছরে ২ হাজার টাকা এবং চাষের কাজে সাধারণভাবে সাহায্য করা ও পুকুর দেখাশুনা করার জন্য নিযুক্ত কোন সাহায্যকারীর পারিশ্রমিক হিসাবে চুক্তিমত বছরে ৩ হাজার টাকা খরচ করা হলেও আঁতুড় পুকুরে চাষে (মাগুর মাছের চাষ-সহ) বছরে বিঘা প্রতি জলকরে ১০ হাজার টাকা লাভ করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রুই, কাতলা, মৃগেলের ডিমপোনার পরিবর্তে আঁতুড় পুকুরে একই পদ্ধতিতে সিলভার কার্প অথবা গ্রাস কার্পেরও ডিমপোনার চাষ করা যায়। কেবলমাত্র গ্রাস কার্পের ডিমপোনার ক্ষেত্রে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে সরষের খোল ও চালের কুঁড়োর পরিবর্তে অতি সূক্ষ্মপানা যথা সুজিপানা বা পোস্তপানা ব্যবহার করতে হয়।

লালন পুকুরে চারাপোনার চাষ :

চাষের বিবরণ :

ক) ইউনিট এলাকা : ০·১৩ হেক্টর বা ১ বিঘা

খ) জলের গভীরতা : ১·৩—১·৬ মিটার বা ৪—৫ ফুট (গড়ে ৪ ফুট)

গ) মজুত-করা ধানিপোনা ছোট চারাপোনার বিভিন্ন প্রজাতির মাছ : রুই, কাতলা, মৃগেল

ঘ) ধানিপোনা ছোট চারাপোনা সংগ্রহের উৎস : নিজস্ব আঁতুড় পুকুরের উৎপাদন থেকে অথবা অন্য কোনো মৎস্যবীজ খামার বা মৎস্যবীজ বিক্রয়ের আড়ত থেকে

ঙ) মহুয়া খোলের পরিমাণ : ৪০০ কেজি

চ) পুকুরে ধানিপোনা/ছোট চারাপোনা ছাড়ার সংখ্যা :

১ম বার……৮০ হাজার ধানিপোনা (১২—১৩ মিলি-মিটার বা গড়ে ½ ইঞ্চি সাইজের)

২য় বার……৪০ হাজার ছোট চারাপোনা (২—৩ সেন্টি-মিটার বা গড়ে ১ ইঞ্চি সাইজের)

ছ) চুন প্রয়োগের পরিমাণ : প্রথমবার ধানিপোনা ছাড়ার আগে পুকুর তৈরীর সময় ৪০ কেজি এবং দ্বিতীয়বার ছোট চারাপোনা ছাড়ার আগে ৮ কেজি

জ) সার প্রয়োগের পরিমাণ :

কাঁচা গোবর—প্রথমবার পুকুর তৈরীর সময় ৪০০ কেজি এবং দ্বিতীয়বার, প্রথমবারের ফসল তুলে নেওয়ার পর ছোট চারাপোনা ছাড়ার আগে ২০০ কেজি

সরষের খোল—১৫ দিন অন্তর ১৬ কেজি হিসাবে প্রথম পর্যায়ে ৫০—৬০ দিনের চাষে ৬০ কেজি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩০—৪০ দিনের চাষে ৩৬ কেজি, মোট ৯৬ কেজি

ঝ) কেরোসিন তেলের পরিমাণ : দু'বারে যথাক্রমে ধানিপোনা ও ছোট চারাপোনা ছাড়ার আগে প্রতিবার ২৮ লিটার হিসাবে মোট ৫৬ লিটার

ঞ) পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্য : (১ : ১ অনুপাতে মিশ্রিত চালের কুঁড়ো ও সরষের খোল) পুকুরে মজুত করা ধানিপোনা/ছোট চারাপোনার মোট ওজনের শতকরা ৪—৫ ভাগ হিসাবে প্রথম পর্যায় ৫০—৬০ দিনের চাষে ৮০ কেজি এবং দ্বিতীয় পর্যায় ৩০—৪০ দিনের চাষে ৭০ কেজি

ট) চারাপোনার (৬—৭·৫ সেমি বা মোটামুটি ২১/২—৩ ইঞ্চি সাইজের) উৎপাদন : প্রথম পর্যায়ে ধানিপোনার চাষ থেকে—ছাড়া ধানিপোনার মোট সংখ্যার ৬৫% বা ৫২ হাজার দ্বিতীয় পর্যায়ে ছোট চারাপোনার (২-৩ কেজি) চাষথেকে—ছাড়া চারাপোনার মোট সংখ্যার ৭১% বা ৩০ হাজার মোট উৎপাদন : ৮২ হাজার

ঠ) উৎপন্ন ফসলের বিলি-বন্দোবস্ত : ১) বিক্রি······৭৫ হাজার ২) অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের (১০—১২·৫ সেমি বা ৪-৫ ইঞ্চি) চারাপোনা উৎপাদনের জন্য পুকুরে অবশিষ্ট হিসাবে মজুত রাখা—৭ হাজার তৃতীয় পর্যায়ে (পুকুরে অবশিষ্ট ৭ হাজার চারাপোনার চাষ) চাষের বিবরণ:

ক) চুন প্রয়োগ : প্রতি মাসে ৮ কেজি হিসাবে প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে যথাক্রমে ৮ কেজি ও ৪ কেজি

খ) সার প্রয়োগ :

গোবর—প্রতি মাসে ২০০ কেজি হিসাবে ৪০—৫০ দিনের চাষে ৩০০কেজি, সরষের খোল—১৫ দিন অন্তর ১৬ কেজি হিসাবে ৪০—৫০ দিনের চাষে প্রথম মাসে ৩২ কেজি ও দ্বিতীয় মাসে ১৬ কেজি, মোট ৪৮ কেজি

গ) পরিপূরক খাদ্য : ৪০—৫০ দিনের চাষে মোট ১০০ কেজি

ঘ) উৎপাদন : মজুত চারাপোনার সংখ্যার ৮৫% বা প্রায় ৬ হাজার চারাপোনা (১০—১২·৫ সেমি বা ৪—৫ ইঞ্চি সাইজের)

ঙ) উৎপন্ন ফসলের বিলি-বন্দোবস্ত :

১) বিক্রি.......৪০০০টি চারাপোনা (১০—১২·৫ সেমি)

২) বিক্রয়োপযোগী মারমাছ উৎপাদনের জন্য পুকুরে মজুত রেখে চাষ করা ···২০০০টি

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে পুকুর তৈরীর কাজ শুরু করে তৃতীয় পর্যায়ের চাষের কাজ শেষ করতে মোট সময় লাগে প্রায়

৬—৬॥ মাসকাল। বছরের ১২ মাসের বাকী ৫॥—৬ মাসকাল লালন পুকুরের সদ্ব্যবহারের জন্য পুকুরে মজুত অবশিষ্ট ২০০০ চারাপোনা চাষ করে বিক্রয়োপযোগী মারমাছ তৈরী করা যেতে পারে অথবা উৎপন্ন সমস্ত চারপোনা বিক্রি করে দিয়ে বিকল্প চাষ হিসাবে পুকুরে মাগুর মাছের চাষ করা যেতে পারে।

মারমাছ তৈরী (রুই, কাতলা, মৃগেল) করার জন্য চাষের বিবরণঃ

ক) পুকুরে চুন প্রয়োগ : প্রতি মাসে ৮ কেজি হিসাবে ৪৪ কেজি (৫॥ মাসের চাষে)

খ) সার প্রয়োগ :
গোবর—প্রতি মাসে ২০০ কেজি হিসাবে ১১০০ কেজি
সরষের খোল—১৫ দিন অন্তর ১৬ কেজি হিসাবে মোট ১৭৬ কেজি

গ) পরিপূরক খাদ্য—৪০০ কেজি (পুকুরে মজুত মাছের ওজনের শতকরা ৪—৫ ভাগ হিসাবে প্রতিদিন দেয়)

ঘ) উৎপাদন : ৫॥—৬ মাসকালের চাষে গড়ে ২০০ গ্রাম ওজনের ১৬০০টি মাছ (মজুত মাছের ৮০%) বা ৩২০ কেজি বিক্রয়োপযোগী মারমাছ

<u>ব্যয়ের হিসাব :</u>	টাকা
১) পুকুরের আগাছা ও পাড়ের ঝোপ-জঙ্গল ইত্যাদি পরিষ্কার বাবদ জন-মজুরী	১০০
২) ৪ কুইন্টাল বা ৪০০ কেজি মহুয়া খোলের দাম	৪০০
৩) ৮০ হাজার ধানিপোনার (½ ইঞ্চি) দাম—প্রতি ১০ হাজার ১৫০ টাকা হিসাবে	১২০০
৪) ৪০ হাজার ছোট চারাপোনার (গড়ে ১ ইঞ্চি) দাম প্রতি হাজার ২৫ টাকা হিসাবে	১০০০

৫)	১০৪ কেজি চুনের দাম	৮৩
৬)	২০০ কেজি গোবরের দাম	২০০
৭)	৩২০ কেজি সরষের খোলের দাম	৫১২
৮)	৫৬ লিটার কেরোসিন তেলের দাম	১৪০
৯)	৬৫০ কেজি পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্যের দাম	৭১৫
১০)	পুকুরে জাল দেওয়ার খরচ (জাল-ভাড়া ও জন-মজুরী)	৮০০
১১)	অন্যান্য বিবিধ খাতে খরচ	১৭৫
	মোট ব্যয়	৫৩২৫ টাকা

আয়ের হিসাব ঃ টাকা

১)	৭৫ হাজার চারাপোনা (২½—৩ ইঞ্চি) বিক্রি-করা বাবদ আয়—প্রতি হাজার ৭৫ টাকা হিসাবে	৫৬২৫
২)	৪০০০ চারাপোনা (৪-৫ ইঞ্চি) বা ১০০ কেজি বিক্রি-করা বাবদ আয় প্রতি কেজি ১৮ টাকা হিসাবে	১৮০০
৩)	৩২০ কেজি মারমাছ বিক্রি-করা বাবদ আয়—প্রতি কেজি ২০ টাকা হিসাবে	৬৪০০
	মোট আয়	১৩৮২৫ টাকা

উপরে বর্ণিত আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ১ বিঘা আয়তন লালনপুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেলের ধানিপোনা ও চারা-পোনার চাষে বছরে ৮৫০০ টাকা পরিমাণ লাভ করা যায়। আঁতুড় পুকুরে ডিমপোনা চাষের তুলনায় এক্ষেত্রে লাভের অঙ্ক কিছুটা কম হলেও (বিঘা প্রতি জলকরে ১৫০০ টাকা) মনে রাখা দরকার যে

আঁতুড় পুকুরে মাত্র ৩—৪ দিন বয়েসের ডিমপোনা ছেড়ে চাষে ঝুঁকি নিতে হয় অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রে পুকুরের সামান্য প্রতিকূল পরিবেশেই পুকুরে ছাড়া সমস্ত ডিমপোনাই 'বসে' যায় (মারা যায়)। এর ফলে পুকুরে নতুন করে আবার ডিমপোনা ছাড়া বাবদ আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও মরশুমের সীমাবদ্ধ সময়কালের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় ধানিপোনাও ছোট চারাপোনা উৎপাদনের লক্ষ্য-মাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয় না এবং অনিবার্যভাবে সারা বছরের চাষে সার্বিকভাবে লাভের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পায়।

বিকল্প চাষ ঃ

তৃতীয় পর্যায়ে চাষের শেষে পুকুরে উৎপন্ন রুই, কাতলা, মৃগেলের যাবতীয় চারাপোনা তুলে বিক্রি বা মজুত পুকুরে স্থানান্তরিত করে দিয়ে লালন-পুকুরে মাগুর মাছের চাষ করা যায়।

ব্যয়ের হিসাব ঃ	টাকা
১) ৬০০০টি মাগুরের চারাপোনা—গড়ে প্রতিটি ১০ গ্রাম ওজনের—মোট ৬০ কেজির দাম—প্রতি কেজি ২২ টাকা হিসাবে	১৩২০
২) মাছকে খাওয়ানোর জন্য ৩৬০০ কেজি কৃত্রিম খাদ্য তৈরীর খরচ—গোবর ২১৬০ কেজি, চালের কুঁড়ো ৭২০ কেজি, বাদাম খোল ৩৬০ কেজি ও সরষের খোল ৩৬০ কেজি	১৯৪০
৩) পুকুরে জাল দেওয়ার খরচ (জাল-ভাড়া ও জন-মজুরী)	৫০০
৪) অন্যান্য বিবিধ খরচ	২৪০
মোট ব্যয়	৪০০০ টাকা

<u>আয়ের হিসাব ঃ</u> টাকা

৪৮০০টি বিক্রয়োপযোগী মাগুর মাছ
(ছাড়া চারাপোনার শতকরা ৮০ ভাগ)
—গড়ে প্রতিটি ১০০ গ্রাম ওজনের বা মোট
৪৮০ কেজি মাছ বিক্রি বাবদ আয়—
প্রতি কেজি ২৫ টাকা হিসাবে ১২০০০

মোট আয় ১২০০০ টাকা

উপরে বর্ণিত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী এক বিঘা আয়তনের লালন-পুকুরে চাযের ৪র্থ পর্যায়ে রুই, কাতলা, মৃগেলের পরিবর্তে বিকল্প চাষ হিসাবে মাগুর মাছের চাষ করে লাভ করা যায় ৮০০০ টাকা। এই হিসাবের নিরিখে সারা বছরে লালন-পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেলের চারাপোনার চাষ (৩য় পর্যায় পর্যন্ত) ও পরে মাগুর মাছের চাষ করে বিঘা প্রতি জলকরে মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১২০০ টাকা (সারা বছরে—১২ মাসে—চাষে মোট আয় ২০৩২৫ টাকা থেকে মোট ব্যয় ৮১২৫ টাকা বাদ দিয়ে—৩য় পর্যায় পর্যন্ত উৎপন্ন যাবতীয় চারাপোনা বিক্রি করে দেওয়ার দরুন বাড়তি আয় ৯০০ টাকা আয়ের হিসাবে যোগ করে এবং ৪র্থ পর্যায়ে রুই, কাতলা, মৃগেলের চাষে আনুমানিক ব্যয় ১২০০ টাকা মোট ব্যয়ের অঙ্ক থেকে বাদ দিয়ে)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাধারণত লালন-পুকুর তৈরীর (মহুয়া খোল, চুন দেওয়া ইত্যাদি) কাজে হাত দিতে হয় বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এবং সারা বছরের চাষ বলতে পরের বছরের বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত চাষ করা বোঝায়।

পালন বা মজুত পুকুরে ছয় জাতীয় মাছের মিশ্র-চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

চাষের বিবরণ ঃ

ক) ইউনিট এলাকা ঃ এক হেক্টর বা সাড়ে সাত বিঘা

খ) জলের গভীরতা (গড়) : ৫ ফুট

গ) মহুয়া খোলের পরিমাণ : ৩৭৫০ কেজি

ঘ) পুকুরে মজুত-করা বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চারাপোনার :

১) সংখ্যা : ৭৫০০ বা বিঘা প্রতি ১০০০

২) আকার (সাইজ) : ৪—৫ ইঞ্চি

৩) মোট ওজন : ১৫০ কেজি

৪) মাছের অনুপাত :

কাতলা ১ : সিলভার কার্প ২ : রুই ৩ : গ্রাস কার্প ১ : মৃগেল ১.৫ : কমন কার্প (আমেরিকান রুই) ১.৫

অর্থাৎ

কাতলা ৭৫০, সিলভার কার্প ১৫০০, রুই ২২৫০, গ্রাস কার্প ৭৫০, মৃগেল ১১২৫ ও কমন কার্প ১১২৫

ঙ) চুনের পরিমাণ : ৯০০ কেজি

চ) সারের পরিমাণ :

১) কাঁচা গোবর—১২০০০ কেজি

২) ইউরিয়া—২৪৮ কেজি

৩) সিংগিল সুপারফস্‌ফেট—৪১২ কেজি

ছ) পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্যের পরিমাণ : ১২০০০ কেজি (গ্রাস কার্প বাদে এবং শীতকালের ৩।।—৪ মাস ছাড়া বছরের অন্যান্য সময়ে পুকুরে মজুত অন্যান্য পাঁচ প্রজাতির মাছের মোট ওজনের শতকরা ৩ ভাগ হিসাবে প্রতিদিন। শীতকালে পরিমাণ কমিয়ে মাছের মোট ওজনের শতকরা ১ ভাগ।)

জ) মাছ ধরা ও বিক্রি : সম্পূর্ণ মেয়াদকাল পর্যন্ত চাষ ও পালন করার পর দ্বাদশ (১২) মাসের শেষে

ঝ) মোট উৎপাদন ১২ মাসের চাষে) : ৪৫০০ কেজি স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা ও পরিচালন দক্ষতার তারতম্যে এই হিসাবেরও তারতম্য ঘটা স্বাভাবিক।

ব্যয়ের হিসাব :

		টাকা
১)	পুকুরের আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার, প্রয়োজনে পাড় মেরামত ইত্যাদি কাজের জন্য জন-মজুরী	৫০০
২)	৩৭৫০ কেজি মহুয়া খোলের দাম—প্রতি কুইন্টাল ১০০ টাকা হিসাবে	৩৭৫০
৩)	প্রতি কেজি গড়ে ১৮ টাকা হিসাবে ১৫০ কেজি চারাপোনার দাম	২৭০০
৪)	প্রতি ১০০ কেজি ১০ টাকা হিসাবে ১২০০০ কেজি কাঁচা গোবরের দাম	১২০০
৫)	প্রতি কুইন্টাল ৮০ টাকা হিসাবে ৯০০ কেজি চূনের দাম	৭২০
৬)	২৪৮ কেজি ইউরিয়া ও ৪১২ কেজি সিংগিল সুপারফস্‌ফেটের দাম	১০৩০
৭)	৬০০০ কেজি চালের কুঁড়ো (প্রতি কুইন্টাল ৬০ টাকা) ও ৬০০০ কেজি সরষের খোলের দাম (প্রতি কুইন্টাল ১৬০ টাকা)	১৩২০০
৮)	প্রতিদিন গ্রাস কার্পের খাওয়ার জন্য কাঁটা ঝাঁঝি/ঘাস সংগ্রহ করা ও পুকুরে দেওয়া, অন্যান্য মাছকে খাওয়ানোর জন্য নিয়মিত খাদ্য দেওয়া এবং অন্যান্য কাজে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত একজন লোকের চুক্তিমত মাসিক ২৫০ টাকা হিসাবে ১২ মাসের মজুরী বাবদ খরচ	৩০০০
৯)	মাছের ব্যায়াম, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গড়-ওজন নির্ধারণের জন্য প্রতি মাসে ১ দিন হিসাবে (প্রথম মাস বাদে) ও দ্বাদশ মাসের শেষে মাছ ধরা ও বিক্রির জন্য ৮—১০ দিন পুকুরে জাল দেওয়ার দরুন জাল-ভাড়া ও জনের মজুরী বাবদ খরচ	২৪০০

১০) মগ, বালতি, বাঁশ, দড়ি, টর্চলাইট, ব্যাটারী, পটাশ পারম্যাঙ্গানেট, গ্যামাক্সিন ইত্যাদি খরিদ ও অন্যান্য বিবিধ খাতে (জন-মজুরী ইত্যাদি) খরচ ১৫০০

মোট ব্যয় : ৩০০০০ টাকা

আয়ের হিসাব :

৪৫০০ কেজি মাছের (৭০০ গ্রাম—১৫০০ গ্রাম) বিক্রয় মূল্য—গড়ে ২০ টাকা কেজি হিসাবে (রুই, কাতলা, মৃগেল মাছ প্রতি কেজি ২২—২৫ টাকা দরে বিক্রি করা সম্ভব হলেও সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কমন কার্প সাধারণত ১৫-১৮ টাকা কেজি হিসাবে বিক্রি হবে ধরে নিয়ে মোট উৎপাদনের বিক্রয় মূল্য গড়ে ২০ টাকা কেজি হিসাবে ধরাই যুক্তিযুক্ত) ৯০০০০

মোট আয় : ৯০০০০ টাকা

উপরে বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী সাড়ে সাত বিঘা জলকরে ছ' জাতীয় মাছের মিশ্র-চাষে এক বছরে লাভের পরিমাণ আশা করা যায় ৬০০০০ টাকা, অর্থাৎ বিঘা প্রতি জলকরে ৮০০০ টাকা। দক্ষ ও উন্নত পরিচালন ব্যবস্থায় প্রতি হেক্টর জলকরে এক বছরের চাষে মাছের উৎপাদন ৬০০০ কেজি পর্যন্ত করা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে স্বভাবতই আরও অনেক বেশী লাভের পরিমাণ আশা করা যায়।

গলদা চিংড়ির চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব :

চাষের বিবরণ :

ক) ইউনিট এলাকা : ১ (এক) বিঘা

খ) জলের গভীরতা (গড়) : ৪ ফুট

গ) মহুয়া খোলের পরিমাণ : ৪০০ কেজি

ঘ) পুকুরে চিংড়ির চারাপোনা (১৷—২ ইঞ্চি) ছাড়ার সংখ্যা : ১০ হাজার

ঙ) চুন প্রয়োগের পরিমাণ : পুকুর তৈরীর সময় ৪০ কেজি এবং চিংড়ির চারা ছাড়ার পরের মাস থেকে প্রতি মাসে ১০ কেজি হিসাবে ৫ মাসে ৫০ কেজি

চ) সার প্রয়োগের পরিমাণ :

১) কাঁচা গোবর—পুকুর তৈরীর সময় ২০০ কেজি

২) সরষের খোল—চিংড়ির চারা পুকুরে ছাড়ার পরের মাস থেকে প্রতি মাসে ২০ কেজি হিসাবে ৫ মাসে ১০০ কেজি

ছ) পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্যের পরিমাণ : ৬০০ কেজি

জ) উৎপাদন : জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমদিকে পুকুরে চিংড়ির চারা ছেড়ে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ফসল তুলে বিক্রি করা হ'লে ৬ মাসের চাষে গড়ে প্রতিটি ৪০ গ্রাম ওজনের মোট ৭৫০০টি (ছাড়া চারার সংখ্যার শতকরা ৭৫টি হিসাবে) গলদা চিংড়ির উৎপাদন আশা করা যায়।

চিংড়ির চারা ছাড়ার আগে অবশ্যই পুকুরে জাল টেনে সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি ধ্বংস করা এবং পোকামাকড়ের আধিক্য থাকলে কেরোসিন তেল ব্যবহার করা দরকার।

গলদা চিংড়ির ফসল সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়ার পর (প্রয়োজনে পাম্পের সাহায্যে পুকুরের জলের গভীরতা কমিয়ে নিয়ে) পুকুরে আরও ৫ মাসের জন্য (পরের বছরে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি পুকুর তৈরীর কাজে হাত দেওয়ার সময় পর্যন্ত) মাগুর মাছের চাষ করে পুকুরের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে আর্থিক অবস্থার উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। গলদা চিংড়ির একক চাষে ৬ মাসের মেয়াদে :

<u>ব্যয়ের হিসাব :</u>	টাকা
১) পুকুরের আগাছা, জঙ্গল ইত্যাদি পরিষ্কারের জন্য জনের মজুরী বাবদ	১০০

২)	৪০০ কেজি মহুয়া খোলের দাম	৪০০
৩)	৯০ কেজি চুনের দাম	৭২
৪)	২০০ কেজি গোবরের দাম	২০
৫)	১০ হাজার চিংড়ির (গলদা) চারার দাম (১৷৷—২ ইঞ্চি সাইজের) প্রতি হাজার ১০০ টাকা হিসাবে	১০০০
৬)	১০০ কেজি সরষের খোলের দাম	১৬০
৭)	৬০০ কেজি পরিপূরক খাদ্যের দাম(১ : ১ অনুপাতে মিশ্রিত সরষের খোলের গুঁড়ো ও চালের কুঁড়ো—চিংড়ির মোট ওজনের শতকরা ৪—৫ ভাগ হিসাবে)	৬৬০
৮)	পুকুরে জাল দেওয়ার খরচ— (প্রতি মাসে চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গড় ওজন নির্ণয় এবং পরিশেষে বিক্রির উদ্দেশ্যে চিংড়ি ধরার জন্য প্রধানত খ্যাপলা জালই ব্যবহারের প্রয়োজন হওয়ায় জাল-ভাড়া ও জনের মজুরী বাবদ খরচ অন্যান্য মাছচাষের ক্ষেত্রের তুলনায় কিছুটা কম হওয়াই স্বাভাবিক)	৫০০
৯)	অন্যান্য বিবিধ খাতে খরচ— (প্রয়োজনে পাম্পের সাহায্যে পুকুরের কিছু পরিমাণ জল বাইরে বার করে দেওয়ার খরচ সমেত—ফলে ফসল তুলে নেওয়ার পরপরই একই পুকুরে মাগুর মাছ চাষে বাড়তি সুযোগও পাওয়া যায়)	৩৮৮
	মোট ব্যয় :	৩৩০০ টাকা

আয়ের হিসাব ঃ টাকা

প্রতিটি গড়ে ৪০ গ্রাম ওজনের ৭৫০০টি গলদা চিংড়ি (ছাড়া চারার শতকরা ৭৫টি হিসাবে) —মোট ওজন ৩০০ কেজি—প্রতি কেজি ৩০ টাকা হিসাবে বিক্রি করা বাবদ আয় ৯০০০

মোট আয় ঃ ৯০০০ টাকা

অতএব লাভের পরিমাণ ঃ ৫৭০০ টাকা

মাগুর মাছের চাষে—১২ মাসের অবশিষ্ট ৫ মাসের মেয়াদের ঃ

ব্যয়ের হিসাব ঃ

মোট ব্যয় ঃ ৪০০০ টাকা (লালন-পুকুরে চারাপোনার চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব দ্রষ্টব্য)

আয়ের হিসাব ঃ

মোট আয় ঃ ১০৮০০ টাকা (লালন-পুকুরে চারাপোনার চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব দ্রষ্টব্য। তবে, লালন-পুকুরে ৫॥ মাসের পরিবর্তে এখানে ৫ মাসের চাষে উৎপন্ন মাছের প্রতিটির গড় ওজন দাঁড়ায় ৯০ গ্রাম পরিমাণ এবং সেই হিসাবেই ৪৮০০টি মাগুর মাছ বিক্রি করে পাওয়া যায় লালন-পুকুরের ১২ হাজার টাকার পরিবর্তে ১০৮০০ টাকা)

অতএব, এখানে মাগুর মাছ চাষে লাভের পরিমাণ ঃ ৬৮০০ টাকা।

উপরে বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী এক বিঘা আয়তনের জলকরে ৬ মাসের জন্য গলদা চিংড়ির চাষ এবং পরে ঐ একই পুকুরে মাগুর মাছের চাষ করে সারা বছরের হিসাবে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৫০০ টাকা। স্পষ্টতই এই বিশেষ ধরনের চাষে লাভের পরিমাণ যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

মাছের প্রজনন

চাষোপযোগী আমাদের দেশী মাছ রুই, কাতলা, মৃগেল বর্ষাকালে নদীতে স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়ায় ডিম ছাড়ে। নদীর জলেই সেই ডিম ফুটে তা থেকে ডিমপোনা বেরিয়ে আসে। সেই ডিমপোনা নদী থেকে সংগ্রহ করে পুকুরে চাষ করা হয়। বাঁকুড়া জেলায় মাটির গুণে বিশেষভাবে তৈরী একজাতীয় পুকুরে (বাঁধ) প্রজননক্ষম মাছ ছেড়ে জলের স্রোত, তাপমাত্রা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে রেখে নদীর প্রায় অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করে মাছের প্রজনন করানো হয়। পুকুর থেকে সেই ডিম তুলে নিয়ে ছোট ছোট মাটির পিটে বা কাপড়ের হাপায় রেখে ফোটানো হয় এবং তা থেকে ডিমপোনা উৎপন্ন হয়।

প্রণোদিত প্রজনন কী এবং কেন?—দীর্ঘকাল ধরে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফলে এখন রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছকে বিশেষ পদ্ধতিতে বদ্ধ জলাশয়েও ডিম পাড়ানো যায়। এই পদ্ধতির মূলনীতি হল, প্রজননক্ষম সুপরিণত স্ত্রী ও পুরুষ মাছের দেহে মাছের পিটুইটারী হরমোন ইন্‌জেকশন দিয়ে তাদের মধ্যে এক যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা, যাতে রতিক্রিয়ায় প্রমত্ত হয়ে উত্তেজনার চরম অবস্থায় স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে ও পুরুষ মাছ একই সঙ্গে শুক্ররস বা মিল্ট্ নির্গত করে ঐ ডিমের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে ডিমকে নিষিক্ত করে। এইভাবে হরমোন ইন্‌জেকশনের সাহায্যে মাছকে প্রজনন ক্রিয়ায় প্রণোদিত করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে বলা হয় প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতি। স্পষ্টতই একে মাছের স্বাভাবিক প্রজননের পর্যায়ে ফেলা যায় না, একে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি বলাই যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে বাঁকুড়ার বাঁধেও এই পদ্ধতি আংশিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রজননের জন্য বাঁধে একদিনে এককালীন যতগুলি প্রজননক্ষম মাছ ছাড়া হয় তার শতকরা

১০-১৫ ভাগ মাছকে হরমোন ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়। ইনজেকশন দেওয়া এইসব মাছ উত্তেজিত ও প্রজনন ক্রিয়ায় প্রণোদিত হয়ে ডিম দিতে শুরু করলে ইন্‌জেকবিহীন অবশিষ্ট মাছের মধ্যেও উত্তেজনার ভাব দেখা দেয় এবং তারাও প্রণোদিত হয়ে প্রজনন ক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ও ডিম ছাড়ে। অতীতে বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই স্ব-ইচ্ছায় ডিম দেওয়ার প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিতে এই সব বাঁধে অল্প সংখ্যক মাছ প্রজনন ক্রিয়ায় রত হতো, গরিষ্ঠ সংখ্যার মাছ প্রায়ই নিষ্ক্রিয় থাকতো এবং এর ফলে সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত।

নদী থেকে যে ডিমপোনা পাওয়া যায় তা চাষ উপযোগী মাছ ছাড়াও মৎস্যভূক মাছ ও নানা আমাছার সংমিশ্রণ। আবার, বাঁকুড়ার বাঁধের ডিমপোনার বীজ হিসাবে উৎকর্ষতার মানেরও যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। এইসব ডিমপোনা থেকে উৎপাদিত চারাপোনা ও মাছের 'বাড়' দিন দিন কমছে। অতীতে প্রজনন কাজে ব্যবহারের জন্য পুকুরে পালন করা হতো সীমিত সংখ্যায় বড় আকারের মাছ। বর্তমানে অধিক উৎপাদন তথা অধিক মুনাফার তাগিদে পুকুরে মাত্রাধিক অতিরিক্ত সংখ্যায় মাছ রাখা হয়। পরিমিত স্থান ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে এইসব মাছ স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে না, যদিও মাটির বিশেষ গুণে যথাসময়ে প্রজননক্ষম হয়ে ওঠে। বছরের পর বছর ধরে এই সব ছোট খর্বাকৃতি মাছকে প্রজনন করানোর ফলে পরিবেশজনিত কারণে প্রজননকারী মাছের সাময়িক-ভাবে অর্জিত বামনত্বের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মের দেহকোষের 'জিনে' সঞ্চারিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বেঁটে পিতামাতা মাছেদের উৎপাদিত মৎস্যবীজের দ্রুতবর্ধনশীল বৈশিষ্ট্য লোপ পাওয়ায় ঐ সব মৎস্যবীজ থেকে তৈরী চারাপোনাদের প্রচুর খাদ্য যোগান দিলেও তাদের দেহের ওজন বৃদ্ধির হার কিছুতেই পুরাতন স্বাভাবিক স্তরে পৌঁছতে পারছে না, তারা বেঁটে বা বামন আকারই প্রাপ্ত হচ্ছে। মাছের বীজের প্রধান দুটি উৎসের এই হতাশব্যঞ্জক

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র কৃত্রিম বা প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতিই মাছের বীজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির তথা দেশের আবাদী জলাশয়ে মাছের ফসল উৎপাদনের হার ও পরিমাণ বাড়াবার একমাত্র হাতিয়ার। মাছচাষীর চাষের খরচ কমিয়ে লাভের পরিমাণ বাড়াতে এবং দেশে সামগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে কেবলমাত্র বড় আকারের চাষযোগ্য মাছের ব্যাপকহারে প্রজননের জন্য বিজ্ঞানের আশীর্বাদধন্য এই নতুন প্রযুক্তিকে সার্থকভাবে কাজে লাগানো বিশেষ প্রয়োজন এবং স্বভাবতই উৎসাহী মাছচাষী মাত্রই এই প্রযুক্তি ও পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানবার জন্য আগ্রহী হবেন।

পিটুইটারি গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ প্রণোদিত প্রজননের জন্য ইন্‌জেকশনে যে পিটুইটারি গ্রন্থি ব্যবহার করা হয় তা সংগ্রহ করতে হয় পরিণত (ডিমযুক্ত স্ত্রী মাছ অথবা মিল্ট্‌যুক্ত পুরুষ মাছ) মাছের মাথা থেকে। যে কোন জাতের পরিণত মাছের গ্রন্থিতেই কাজ হয়, এমন কী বোয়াল মাছেরও। তবে সাধারণত রুই, কাতলা, মৃগেল ও কমন কার্পের গ্রন্থিই সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়, কারণ এই জাতের মাছই বাজারে বেশী আমদানী হয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত গ্রন্থি সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য, কমন কার্পের গ্রন্থি যে-কোন সময়েই সংগ্রহ করা যেতে পারে, কারণ কমন কার্পের পরিণত মাছ বছরের প্রায় সব সময়েই পাওয়া যায়। তাছাড়া কমন কার্পের গ্রন্থি খুবই উঁচুমানেরও। মোট কথা, স্ত্রী, পুরুষ ও জাত নির্বিশেষে যে-কোন পরিণত মাছের গ্রন্থিই ব্যবহারযোগ্য। বরফ দেওয়া মাছেরও গ্রন্থি ব্যবহার করা যেতে পারে, কেবল দেখতে হবে মাছটি যেন পচা না হয়; কারণ পচা মাছের গ্রন্থির হরমোনের মাত্রা ও কার্যক্ষমতা ঠিক থাকে না।

মাছের মাথার পেছন দিকে খুলির অংশটা একটি ধারালো ছুরি বা বঁটি দিয়ে কেটে ফেললে প্রথমেই চোখে পড়ে মগজের ওপরের ঘি-টা। তুলো দিয়ে ঘি-টা পরিষ্কার করে নিলে মগজটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। চিমটে দিয়ে মগজটা উল্টো করে তুলে নিয়ে সামনের

দিকে সরিয়ে নিলে দেখা যাবে ছোট একটি গর্ত, আর তার ওপর কোণাকোণি তুটো নার্ভ মাঝামাঝি এক জায়গায় কাটাকাটি করেছে। কাটাকাটি করার বিন্দুর ঠিক নীচে একটি পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে ছোট মটর দানার মত পিটুইটারি গ্রন্থিটি। পাতলা পর্দাটা কেটে সরিয়ে খুব সাবধানে কানখুশকি দিয়ে গ্রন্থিটি আলতো-ভাবে তুলে বার করে নিতে হয়। খুব সতর্ক হয়ে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন গ্রন্থিটি অক্ষত, অটুট অবস্থায় তুলে নেওয়া যায়, কারণ সামান্য-তম ঘষা বা আঘাতে গ্রন্থিটি ভেঙ্গে যেতে পারে এবং ভাঙ্গা গ্রন্থিতে হরমোনের পরিমাণ ঠিক থাকে না এবং এ দিয়ে কাজও ভাল হয় না।

গ্রন্থির গায়ে ছিট্ রক্ত বা অন্য কিছু পদার্থ লেগে থাকতে পারে। তাই, তোলার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থিটি একটা ছোট শিশিতে (হোমিও-প্যাথি ওষুধের শিশি হলেও চলে) কিছুটা জলশূন্য সুরাসার বা অ্যাবসলিউট অ্যালকোহলের মধ্যে রেখে শিশিটি আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করে গ্রন্থিটি ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়। দরকার মনে করলে একাধিকবার এইভাবে গ্রন্থিটি পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত প্রতিবার ব্যবহৃত সুরাসার ফেলে দিয়ে। এরপর একটি রঙীন শিশিতে সুরাসার নিয়ে তারমধ্যে গ্রন্থিটি ডুবিয়ে রাখতে হয়। শিশির মুখ ভালভাবে বন্ধ করে সম্ভব হলে রেফ্রিজারেটরে অথবা ঘরে ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিতে হয়। ১০-১২ দিন অন্তর শিশির সুরাসার বদল করা দরকার, বিশেষ করে সুরাসারের রং ঈষৎ হলদে বা ঘোলাটে বলে মনে হলে।

কলকাতার অধিকাংশ ও মফঃস্বলেরও অনেক মাছের বাজারে প্রতি পিস্ দেড় টাকা থেকে তু'টাকা দামে মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি কিনতে পাওয়া যায়। তবে কিনতে হলে সামনে উপস্থিত থেকে পরিণত, টাটকা মাছের মাথা থেকে গ্রন্থি তুলিয়ে নিতে হয়, কারণ অপরিণত, পচা মাছের বা আগের বছরে সংগৃহীত গ্রন্থি, এমন কী পাকা ঢ্যাড়শের ভেতরের মটর দানার মতো বীচিও আজকাল কিছু

ভাল গ্রন্থির সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করা হয়। পিটুইটারি গ্রন্থি সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করা এবং এর কার্যকারিতার ওপর মাছের প্রজননে সাফল্যলাভ বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং বিশুদ্ধ, অক্ষত ও অটুট অবস্থায় গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া ও লক্ষ্য রাখা দরকার।

মাছের প্রাক-প্রজনন পরিচর্যা ঃ মাছের প্রণোদিত প্রজননের কাজে সাফল্যের সর্বপ্রধান উপাদান হল, প্রজননক্ষম সুপরিণত স্ত্রী ও পুরুষ মাছ। কিন্তু বিনা যত্নে মাছ প্রজনন উপযোগী সুপরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এরজন্য দরকার হয় মাছের প্রাক-প্রজনন পরিচর্যা। সাধারণত দু'বছর ও দু'বছরের বেশী বয়সের মাছই প্রজননের জন্য উপযুক্ত। আজকাল অবশ্য একবছর বয়সের মাছেরও প্রজনন করানো হচ্ছে। কিছুটা অল্প বয়সের পুরুষ মাছ দিয়ে কাজ চললেও, দু'বছরের কম বয়সের স্ত্রী মাছ প্রজননে ব্যবহার করা উচিত নয়। কিছুটা বেশী বয়সের বড় আকারের স্ত্রী মাছের প্রজননে সুবিধা এই যে ডিম পাওয়া যায় অনেক বেশী সংখ্যায়, ডিম ফুটে ডিমপোনা উৎপন্নের ও বাঁচার হার হয় বেশী এবং ডিমপোনার বৃদ্ধির হারও হয় অনেক বেশী দ্রুত। সর্বশেষে এই ডিমপোনা থেকে মাছের উৎপাদনও পাওয়া যায় ছোট আকারের মাছের প্রজননে উৎপন্ন ডিমপোনার তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে।

ডিসেম্বর বা পৌষ মাসের প্রথম দিকেই প্রজনন করানোর মতো মাছ বেছে নিয়ে মহুয়া খোল, গোবর বা সরষের খোল দিয়ে তৈরী করা পুকুরে রাখতে হয়। বিঘা প্রতি জলকরে ২৫০ কেজি পরিমাণ মাছ রাখা যেতে পারে। এই সময় স্ত্রী ও পুরুষ মাছ চেনা শক্ত হলেও এক-দেড় মাস পরে পুকুরে জাল দিয়ে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ বাছাই করে পৃথক পৃথক পুকুরে রাখা দরকার। স্ত্রী মাছের পেটের দুধারে দুটি ডিমের ছড়া বাইরে থেকে দেখেই এদের চেনা যায়। তাছাড়া, কানকোর সামনে বক্ষ পাখনার যে দিকটা মাছের দেহের সঙ্গে লেগে থাকে সেই অংশে হাতের আঙ্গুল ঘষে ওপর দিক থেকে

নীচের দিকে টেনে আনলে স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে মসৃণ ও মোলায়েম বলে মনে হয়, আর পুরুষ মাছের ক্ষেত্রে শিরীষ কাগজের ওপর আঙ্গুল ঘষার মতো খস্‌খসে বা কড়্‌কড়ে ভাব অনুভব করা যায়। সিলভার কার্প, রুই, গ্রাস কার্প, মৃগেল ও কমন কার্পের স্ত্রী মাছ একই পুকুরে রাখা যায়। আবার, পৃথক একটি বা একাধিক পুকুরে এইসব প্রজাতির ও কাতলার পুরুষ মাছ একসঙ্গে রাখা যেতে পারে। কাতলার স্ত্রী মাছ রাখার জন্য পৃথক কোন পুকুরের ব্যবস্থা করতে পারলে তাতে সিলভার কার্প ছাড়া আর সব প্রজাতিরই স্ত্রী মাছ রাখা যেতে পারে।

আয়তকার, কিছুটা লম্বা ধরনের এক-দেড় বিঘা আয়তনের ৫-৬ ফুট গভীর পুকুরই প্রজননের জন্য মাছ লালন-পালন করার কাজে উপযুক্ত। এইসব পুকুরের পরিচালন ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে প্রজননক্ষম মাছ পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু সংখ্যায় সুপরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং প্রজননের অনুকূল যে ৪-৪॥ মাসকাল সময় পাওয়া যায় তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায়। এরজন্য একাধিক পুকুরে (প্রয়োজনে কিছুটা ছোট আকারেরও) মাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে, বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মাত্রায় কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহার করে বা এই জাতীয় পরিচর্যামূলক ব্যবস্থার কিছুটা তারতম্য ঘটিয়ে মাছকে পর্যায়ক্রমে আগে-পরে বিভিন্ন দলে প্রজনন কাজের উপযুক্ত করে তৈরী করে নেওয়া যায় সামগ্রিকভাবে কাজের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে। একই সময়ে পুকুরের সব বা অধিকাংশ মাছ প্রজনন-ক্ষম সুপরিণত হয়ে উঠলে সফল প্রজননের ব্যবস্থা করা, বহু সংখ্যক আঁতুড় পুকুর একসঙ্গে তৈরী করা, ডিমপোনা চাষের সুষ্ঠ পরিচালনার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি যেমন নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে, তেমনি আবার সামান্য সংখ্যক মাছের প্রজনন করানোর পর মাছ উপযুক্তভাবে তৈরী হওয়ার জন্য যদি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়, তাহলেও প্রজননের কাজে সামগ্রিকভাবে বাঞ্ছিত সুফল পাওয়া যায় না, কারণ এই সময়ের মধ্যে প্রতিকূল আবহাওয়ার

প্রভাবে বা অন্যান্য কারণেও মাছের দৈহিক অবস্থার অবনতি ঘটারও সম্ভাবনা থাকে।

মাছের প্রাক-প্রজনন পরিচর্যার প্রধান অঙ্গ হলো মাছকে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো। ব্যবহৃত এই কৃত্রিম খাদ্য যতটা সম্ভব তেল বা চর্বিজাতীয় উপাদান বর্জিত হওয়া দরকার। এই বিচারে গমের ভূষি, সরষের খোল ও মুসুর ডালের গুঁড়ো আদর্শ খাদ্য বলে বিবেচিত হতে পারে এবং ২ : ২ : ১ অনুপাতে মিশিয়ে মজুত মাছের দেহের ওজনের শতকরা ২-৩ ভাগ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গমের ভূষির পরিবর্তে চালের কুঁড়ো অথবা সমানভাবে চালের কুঁড়ো ও গমের ভূষিও ব্যবহার করা যেতে পারে সরষের খোল ও মুসুর ডালের গুঁড়োর সঙ্গে। রান্না করা চালের খুদের সঙ্গে সরষের খোল মিশিয়েও মাছকে খাওয়ানো যেতে পারে। খুদ ও খোলের অনুপাত হবে ১:১ (ওজনে রান্নার আগে)। খাদ্য নির্বাচনে এইসব সতর্কতা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে মাছের দেহে মাত্রাধিক চর্বি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ২-৩টি মাছের পেট কেটে পরীক্ষা করলেই এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। এই রকম অবস্থায় মাছকে কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। তাছাড়া প্রজননের ৬-৭ দিন আগে থেকেই মাছকে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া বন্ধ রেখে মাছকে কেবলমাত্র পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগানের ওপর রাখাই সঙ্গত। গ্রাস কার্পকে প্রজননক্ষম ও সুপরিণত অবস্থায় পাওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে কাঁটা-ঝাঁঝি, অঙ্কুরিত ছোলা (কিছুটা চূর্ণ করে) ইত্যাদি খাওয়াতে হয়।

পরিচর্যার আর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হলো, মাসে অন্তত একবার পুকুরে বাইরের জল দেওয়া পাম্পের সাহায্যে যাতে পুকুরের জলে কিছুটা স্রোতের সৃষ্টি হয়। অগভীর নলকূপ থেকে অথবা অক্সিজেনসমৃদ্ধ ও দোষমুক্ত অন্য কোন জলাশয়ের জল দেওয়া যেতে পারে। সম্ভব না হলে যে পুকুরে মাছ আছে সেই পুকুরেরই জল পাম্প করে তুলে আবার ঐ পুকুরেই দিলেও অনেকটা উপকার হয়।

কমপক্ষে ২-৩ ঘণ্টা এইভাবে জল দেওয়া দরকার। প্রজননের এক মাস আগে ২-৩ বার এইভাবে জল দিতে হয়।

প্রতিমাসে অন্তত দুবার পুকুরে জাল টেনে মাছকে তাড়া দেওয়া ও জল খাওয়াতে হয়, মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এতে মাছকে কিছুটা পরিশ্রম করানো বা ব্যায়াম করানো হয়, মাছ শক্ত হয়, শরীরের জড়তা কাটে, প্রজননের কাজের সময় ঘনঘন জাল দেওয়া ও ইন্‌জেকশন দেওয়ার দরুন বাড়তি ধকল সহ্য করার মতো ক্ষমতা ও পটুতা বাড়ে। মাছকে এইভাবে জাল-খাওয়ানো না থাকলে প্রজননের সময় প্রথম ইন্‌জেকশনের পরেই মাছ অর্ধমৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় ইন্‌জেকশন নেওয়ার মতো ক্ষমতা থাকে না। অনেকক্ষেত্রে অতি সুপরিণত মাছও কেবলমাত্র শারীরিক অক্ষমতার জন্যই ডিম ছাড়তে ব্যর্থ হয়। পুকুরে জাল দেওয়ার সময় প্রতিবারই জালের মধ্যে সব মাছকে একত্র করে কিছুটা পটাশ পারম্যাঙ্গানেট গোলা জল ওই মাছের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে তারপর পুকুরে মাছ ছেড়ে দিতে হয়। এতে মাছের দেহে আঘাত-জনিত কোন রোগের সংক্রমণ হওয়ার আশংকা থাকে না। এই সময় মাছ রোগাক্রান্ত হলে মাছের প্রজননক্ষম ও সুপরিণত হওয়ার কাজ ব্যাহত হয়। রোগ প্রকট হলে বা অন্য কোনও কারণে মাছ মারা গেলে পুনরায় উপযুক্ত মাছ সংগ্রহ করে এবং তাদের যথাযথ পরিচর্যা করে ঐ একই মরশুমে প্রজননক্ষম ও সুপরিণত করে তোলা প্রায়দুঃসাধ্য কাজ, কারণ প্রজননের মরশুম তো খুবই স্বল্প স্থায়ী, মাত্র ৪-৪॥ মাসের। পুকুরে ঘনঘন জাল দেওয়া ছাড়াও সুযোগ-সুবিধা থাকলে মাঝে মাঝে মাছকে এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করলে দ্রুত প্রজননক্ষম ও সুপরিণত হওয়ার পক্ষে মাছের যথেষ্ট উপকার হয়। এই সময় স্ত্রী ও পুরুষ মাছ ভালভাবে চিনে নিয়ে পৃথক পৃথক পুকুরে রাখা ছাড়াও মাছের দৈহিক পরিণতির অবস্থা বিচারে মাছকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে খাদ্য ও পরিচর্যার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধিত ব্যবস্থাও

নেওয়া যায়।

প্রজননের উপযুক্ত আবহাওয়া ও তাপমাত্রা ঃ স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টিপাত হলে মাছও স্বাভাবিক নিয়মে যথাসময়ে প্রজননক্ষম ও সুপরিণত হয়ে ওঠে। মাঘ মাস থেকে শুরু করে প্রতি মাসে ২-৩ দিন বৃষ্টি এবং জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে বর্ষার জল পেলে মাছ তৈরী হওয়া সম্বন্ধে কোন দুর্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বৃষ্টিপাত কম হলে কিংবা মরশুমের প্রথমদিকে কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি-হীন শুকো মরশুম চললে মাছের গোনাডের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কিছুটা পরিণত অবস্থাপ্রাপ্ত মাছেরও দৈহিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এই রকম অবস্থায় পুকুরে ঘন ঘন বাইরে থেকে জল দিতে হয় যাতে জলের তাপমাত্রা বেশী বাড়তে না পারে।

প্রজননের দিনক্ষণ ঠিক করা ও ডিম ফোটানোর কাজেও প্রকৃতির আনুকূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, মেঘলা দিন গুঁড়িগুঁড়ি বা মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত মাছের প্রজননে ও ডিম ফোটানোর কাজে বিশেষ সহায়ক। বস্তুত যে জলে মাছ বা ডিমকে রাখা হয় এই কাজে সেই জলের তাপমাত্রা কাজে সাফল্যের সীমানির্দেশক। ২২—২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার জলেই প্রজনন ও ডিম ফোটানোর কাজ সবচেয়ে ভাল হয়। আজকাল অবশ্য প্রজননক্ষেত্রে ফোয়ারা, স্প্রিংক্লার বা পাম্পের সাহায্যে নলকূপের জল ছড়িয়ে অথবা প্রবহ-মান নদী বা খালের জলে প্রজনন ও ডিম ফোটানোর ব্যবস্থা করে জলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হয়। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে প্রণোদিত প্রজননের কাজে বাদলা, ঠাণ্ডা আবহাওয়া তথা অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশের বিশেষ অভাব আছে। জলের তাপমাত্রা ছাড়া আর যে জিনিষটির বিশেষ প্রয়োজন সেটি হলো জলে উপযুক্ত পরিমাণে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উপস্থিতি। প্রতি লিটার জলে কমপক্ষে ২—৩ মিলিগ্রাম পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা চাই।

প্রজননের জন্য সুপরিণত মাছ নির্বাচন ঃ মাছের যথোপযুক্ত পরিচর্যা, প্রজননের অনুকূল আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশের পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রজননক্ষম ও সুপরিণত স্ত্রী ও পুরুষ মাছের সঠিক নির্বাচন। সুপরিণত অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে প্রথম নজরেই পৃথক করে নিতে অবশ্য অসুবিধা হয় না। স্ত্রী মাছের পেটে ডিম থাকায় পেটটা ফোলা, দেহ থেকে যেন খানিকটা বাইরে চলে আসা অবস্থায় থাকে। পুরুষ মাছে এইরকম কোন লক্ষণ থাকে না। পেটের বিস্তার স্বাভাবিক, দেহের সঙ্গে মিশে থাকে, কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ে না। পায়ুদ্বার গর্তটি ছোট, লম্বা ও সাদাটে। আঙ্গুল দিয়ে আলগাভাবে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পায়ুছিদ্র দিয়ে দুধের মতো সাদা শুক্ররস বা মিল্ট্ বেরিয়ে আসে এবং এই দেখে পুরুষ মাছকে সুনিশ্চিতভাবে চেনা যায়। বক্ষপাখনার অমসৃণ, খস্‌খসে ও কড়্‌কড়ে ভাব দেখেও প্রথম নজরেই পুরুষ মাছকে বাছাই করে নেওয়া যায়।

তবুও কেবলমাত্র ফোলা পেট দেখেই স্ত্রী মাছ নির্বাচন করা চলে না। আর যে-সব বিশেষ লক্ষণ দেখে সুপরিণত স্ত্রী মাছ নির্বাচন করতে হয় সেগুলি হলো ঃ

১। মাছের পেট হবে খুব নরম, বিশেষ করে তলপেট বা পায়ুদ্বারের দিকে নীচের অংশে ;

২। পিঠের দিকটা নীচে আর পেটের দিকটা ওপরে, এই-রকম অবস্থায় মাছকে রাখলে, শরীরের মাঝ বরাবর একটা স্পষ্ট খাঁজ দেখা যায় ; খাঁজের দু'পাশে পেটটা ফোলা, খানিকটা ঝোলা, দু'পাশে দুটো ডিমের ছড়া। পেটের চামড়া বেশ পাতলা ;

৩। পায়ুদ্বার গোলাকার, অক্ষত, কিছুটা ফোলা ; ফিকে লাল বা গোলাপী আভাযুক্ত।

বিপরীতভাবে ফোলা অথচ শক্ত, খাঁজবিহীন পেট এবং অস্ফীত, দেহের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকা, সাদাটে পায়ুদ্বার অপরিণত স্ত্রী মাছের লক্ষণ। আবার, আকার ও দেহের ওজনের তুলনায় পেটের ফোলা-

ভাব স্পষ্টত বেশ কম, পেটের বেশীর ভাগ অংশই শক্ত অথবা পেট অস্বাভাবিকভাবে ফোলা অথচ শক্ত, পায়ুদ্বার ক্ষত, অটুট নয়, স্ফীত ও বাইরে বেরিয়ে আসা কিন্তু ঘোর লাল বা রক্তাভ, এগুলি স্ত্রী মাছের অবনতির লক্ষণ। সাধারণত মরশুমের শেষের দিকে অর্থাৎ জুলাই মাসের শেষ থেকেই স্ত্রী মাছের প্রজননক্ষম অবস্থার ক্রমান্বয়ে এইরকম অবনতি ঘটতে থাকে। এই ধরনের মাছ প্রজননের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয় এবং এই কারণে নির্বাচন করা উচিত নয়। এইরকম অবস্থার কোন কোন মাছ সামান্য পরিমাণে ডিম দিলেও ঐ ডিম ছোট, বড় বিভিন্ন আকারের হতে দেখা যায়। এই ডিম থেকে প্রায় ক্ষেত্রেই ডিমপোনা পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রজননের জন্য নির্বাচিত মাছ অবশ্যই নীরোগ, সম্পুর্ণ সুস্থ ও সবল হওয়া দরকার।

প্রজননক্ষেত্র নির্বাচনঃ প্রজনন ও ডিম ফোটানোর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রবহমান নদী বা খালে ভাল ফল পাওয়া যায় জলের স্রোত ও জলে উপযুক্ত পরিমাণে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সহায়তায়। বদ্ধ জলায় এই কাজে কিছুটা সমস্যা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করে জলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে। পুকুর বা অন্য কোন বদ্ধ জলাশয় এই কাজের জন্য নির্বাচন করা হলে যে-যে বিষয় সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা দরকার সেগুলি হলোঃ

১। জলাশয়ের তলদেশ পাঁকমুক্ত হওয়া দরকার, কিছুটা শক্ত, কাঁকড় ও বালিযুক্ত হলে ভাল হয়।

২। সহজে জলশূন্য করা ও জলভর্তি করার সুবিধাজনক ব্যবস্থা থাকা দরকার। পরপর কয়েকদিন কাজের পর সম্পূর্ণ বা আংশিক-ভাবে জলশূন্য করে নিয়ে বাইরে থেকে নতুন জল দিয়ে ভর্তি করা উচিত।

৩। জলের গভীরতা ৩॥—৪ ফুটের বেশী রাখার প্রয়োজন হয় না।

৪। খোলামেলা জায়গায় অবস্থিত হওয়া দরকার যাতে বায়ুমণ্ডলের বাতাস সবসময় জলে মিশতে পারে।

৫। জল অবশ্যই আগাছা, জলজ উদ্ভিদ, সার ও প্ল্যাংকটন-বিহীন এবং কাঁকড়া, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি, কমন কার্প, গ্রাস কার্প ও তিলাপিয়া মাছ থেকে মুক্ত হওয়া দরকার।

৬। প্রজনন ও ডিম ফোটানোর সময় প্রয়োজনে পাম্পের সাহায্যে বাইরে থেকে যে জল দেওয়া হতে পারে সেই বাড়তি জল সহজে যাতে বেরিয়ে যেতে পারে সেইরকম ব্যবস্থা করে রাখা দরকার।

সিমেণ্ট-ইট দিয়ে তৈরী পুকুরই এইসব কাজে সবচেয়ে সুবিধা-জনক, যদি অবশ্য জল ভর্তি ও জলশূন্য করার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যায়। প্রবহমান নদীতে কাজ করলে জোয়ার-ভাঁটার বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। এরকম ক্ষেত্রে ভাসমান হাপা ব্যবহার করা উচিত যাতে জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে হাপাও কোন বাইরের সাহায্য ছাড়াই নিজ থেকে ওঠা-নামা করতে পারে। নদীতে হাপা বসাতে হয় এমন জায়গায় (পাড়ের দিকে) যেখানে স্রোতের গতি খুব বেশী নয়। জলের স্রোত মাছের প্রজননে ও ডিম ফোটানোর কাজে যেমন সাহায্য করে, তেমনি আবার জলের অতিরিক্ত স্রোতের চাপে ডিমের সমূহ ক্ষতি হওয়ারও আশংকা থাকে।

প্রজননে ব্যবহৃত স্ত্রী ও পুরুষ মাছের অনুপাত: প্রজননের কাজে একটি স্ত্রী মাছের ডিম নিষিক্ত করার জন্য স্ত্রী মাছের সমান বা কাছাকাছি ওজনের দুটি পুরুষ মাছ ব্যবহার করার দরকার হয়। স্ত্রী-মাছের সমান ওজনের হলেও মাত্র একটি পুরুষ মাছ ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতে ডিমের নিষিক্তকরণের হার স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ক্ষেত্রেই কম হয়। রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছ প্রজনন-হাপার মধ্যেই ডিম দেয়। তাই, এদের ক্ষেত্রে অবশ্যই ১:২ অনুপাতে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প, বিশেষ করে সিলভার কার্পের ক্ষেত্রে যেহেতু মাছকে হাপার

বাইরে নিয়ে এসে ডিম বার করে নেওয়া হয় এবং পুরুষ মাছের শুক্র-রস ঐ ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে ডিমকে নিষিক্ত করা হয়, স্বাভাবিক কারণেই সেইজন্য এক্ষেত্রে পুরুষ মাছের সংখ্যা নির্ভর করে ডিমের পরিমাণ ও পুরুষ মাছের শুক্ররস বা মিল্ট্-এর যোগানের পরিমাণের ওপর। দেখা গেছে এইরকম কোন কোন ক্ষেত্রে একটি পুরুষ মাছ ব্যবহারেই সম্পূর্ণ ডিমকে নিষিক্ত করা সম্ভব হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক পুরুষ মাছ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

ইন্‌জেকশনে পিটুইটারি গ্রন্থির মাত্রা: স্ত্রী মাছকে দু'বার এবং পুরুষ মাছকে স্ত্রী মাছের দ্বিতীয়বারের সময় একবার ইন্‌জেকশন দিতে হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে ইন্‌জেকশন দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত পিটুইটারি গ্রন্থির মাত্রা স্থির করা হয়েছে। সাধারণত রুই ও মৃগেল স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে এই মাত্রা হলো মাছের দেহের প্রতি কেজি ওজনের জন্য দু'বারে মোট ৯—১০ মিলিগ্রাম এবং কাতলার ক্ষেত্রে ১০—১২ মিলিগ্রাম। সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্পের ক্ষেত্রে এই মাত্রা যথাক্রমে ১০—১২ ও ১০—১৪ মিলিগ্রাম। জাপানী পুঁটির স্ত্রী মাছের জন্য দু'বারে (যদি দু'বার প্রয়োজন হয়) ৬—৮ মিলিগ্রাম। এছাড়া মাছের পরি-পক্কতার মাত্রা বিচারে রুই, কাতলা, মৃগেল এবং জাপানী পুঁটির স্ত্রী মাছকে মাত্র একবার ইন্‌জেকশন দিয়েও প্রজনন করানো যায়। এইরকম ক্ষেত্রে রুই, কাতলা, মৃগেলের জন্য পিটুইটারি গ্রন্থির নক্-আউট মাত্রা হলো সাধারণত ৮—১০ মিলিগ্রাম মাছের প্রতি কেজি ওজনের জন্য এবং জাপানী পুঁটির জন্য ৫—৬ মিলিগ্রাম। যেহেতু এই পদ্ধতিতে স্ত্রী মাছকে মাত্র একবারই ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়, সেইজন্য এইসব ক্ষেত্রে একই সঙ্গে পুরুষ মাছকেও ইন্‌জেকশন দিতে হয় এবং ইন্‌জেকশন দেওয়ার পরপরই স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে একই প্রজনন হাপায় রাখতে হয়। সব প্রজাতিরই পুরুষ মাছের জন্য উপযুক্ত মাত্রা হলো মাছের দেহের প্রতি কেজি ওজনের জন্য ৩—৪ মিলিগ্রাম, যদিও সিলভার কার্প মাছের ক্ষেত্রে ৪—৫ মিলিগ্রাম

মাত্রাই অধিক কার্যকরী হতে দেখা যায় এবং জাপানী পুঁটির ক্ষেত্রে ২—৩ মিলিগ্রাম।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মাছের পরিপক্কতার তথা সুপরিণত অবস্থার তারতম্য বোধে পিটুইটারি গ্রন্থির মাত্রা অবশ্যই কিছুটা কম বা বেশী করা যায়। তবে, এই মূল্যবান বোধশক্তি অর্জন করা ও সার্থকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় কেবলমাত্র দীর্ঘদিনের হাতে-কলমে কাজের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সুবাদে। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রণোদিত প্রজনন প্রক্রিয়ায় যত কম মাত্রায় পিটুইটারি গ্রন্থি ব্যবহার করে প্রজনন কাজে সফলকাম হওয়া যায়, ডিম থেকে ডিমপোনা উৎপাদনের শতকরা হার হয় তত বেশী।

গ্রন্থি-নির্যাস তৈরী ও ইন্‌জেকশন দেওয়ার পদ্ধতি : মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি কঠিন পদার্থ, সরাসরি মাছের দেহে ইন্‌জেকশন করা যায় না। তাই গ্রন্থির নির্যাস করে নিতে হয় পাতিত জলে কিংবা লবণাক্ত জলে। পাতিত জল যে কোন ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। লবণাক্ত জল তৈরী করে নিতে হয়। এক লিটার জলে ৬ গ্রাম পরিমাণ সাধারণ লবণ মিশিয়ে জলটা কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হয় যাতে লবণটা জলে ভালভাবে গুলে গিয়ে লবণের দ্রবণ তৈরী হয়। এরপর কাপড়ের ওপর ঢেলে ছেঁকে ঠাণ্ডা করে নিয়ে ঐ দ্রবণ ব্যবহার করতে হয়।

গ্রন্থি-নির্যাস তৈরীর জন্য একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। সাধারণভাবে একে বলা হয় সেন্ট্রিফিউজ মেশিন (centrifuge machine) এবং এই নামেই কলকাতায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিক্রির দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। এই যন্ত্রের সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও যে কয়েকটি জিনিস কেনার দরকার হয় সেগুলি হলো : টিস্যু হোমোজিনাইজার (tissue homogenizer) বা গ্রন্থি-পেষক টিউব ও দণ্ড, সেন্ট্রিফিউজ টিউব (centrifuge tube), গ্র্যাজুয়েটেড টিউব (graduated tube), ফিলটার পেপার (filter paper), বাড়তি কয়েকটি কাঁচের টেস্ট টিউব (test tube), কাঁচের বীকার

(beaker), ওয়াচ গ্লাস (watch glass) ও ইন্‌জেকশনের সিরিঞ্জ (syringe)।

সুরাসারে সংরক্ষিত কয়েকটি গ্রন্থি একটি ওয়াচ গ্লাসে ঢেলে (কিছুটা সুরাসার সহ) নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অক্ষত, অটুট গ্রন্থি বাছাই করে নিতে হয়, গ্রন্থির ওজনের ভিত্তিতে। এইবার বাছাই করা ঐ গ্রন্থিগুলি একটি ফিলটার পেপারের ওপর ১—২ মিনিট রেখে সুরাসার শূন্য করে শুকিয়ে নিতে হয়। সিরিঞ্জের স্ঁচের অথবা পেষকদণ্ডের আগা দিয়ে একটি একটি করে গ্রন্থিগুলি তুলে নিয়ে কাঁচের পেষক টিউবের ভেতরে নীচের দিকে রাখা হয়। প্রথমে পেষক-দণ্ড দিয়ে শুকনো অবস্থায় ভালভাবে পিষে নিয়ে পরে সামান্য পরিমাণে পাতিত জল বা লবণজল দিয়ে আবার পিষে জলের সঙ্গে খুব ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, পেষার সময় টিউব থেকে একটি ফোঁটাও যেন বাইরে চলে না আসে। গ্রন্থি বিশুদ্ধ হলে এবং পেষার কাজ ভাল হলে ধব্‌ধবে সাদা একটা দ্রবণ পাওয়া যায়। দ্রবণটি সতর্কতার সঙ্গে একটি সেন্ট্রিফিউজ টিউবে ঢেলে নিতে হয়। সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের দুপাশে দুটি সমান মাপের ধাতব টিউব লাগানো থাকে। এক পাশের একটি টিউবের মধ্যে গ্রন্থিরস দ্রবণের কাঁচের টিউবটি বসান হয়। সমান মাপের কাঁচের আর একটি টিউবে প্রথম টিউবে রাখা দ্রবণের সমপরিমাণ যে কোন উৎসের জল নিয়ে টিউবটি যন্ত্রের অপর পাশের ধাতব টিউবের মধ্যে বসিয়ে যন্ত্রের হাতলটি বেশ জোরে অথচ সমান বেগে প্রায় ৩ মিনিটকাল ঘোরাতে হয়। এরপর গ্রন্থিরস দ্রবণের টিউবটি যন্ত্র থেকে পৃথক করে নিয়ে বাইরে স্থিরভাবে রাখলে দেখা যাবে টিউবের ওপরের অংশে একটি পাতলা সাদা তরল পদার্থ, আর একেবারে নীচের অংশে টিউবের সঙ্গে লেগে জমে থাকা একটি তলানি। ওপরের তরল অংশটিই জল মিশ্রিত পিটুইটারি গ্রন্থি নির্যাস এবং নীচের অংশের তলানিটি গ্রন্থির শক্ত পেশী ও অন্যান্য কঠিন বর্জনীয় অংশের সংমিশ্রণ। খুব সতর্কতার সঙ্গে তলানি বাদে গ্রন্থি নির্যাসের শেষ বিন্দু পর্যন্ত একটি পৃথক কাঁচের

টিউবে বা বীকারে ঢেলে নিতে হয় এবং এই টিউব বা বীকার থেকে সিরিঞ্জে টেনে নিয়ে এই নির্যাস মাছের দেহে ইন্‌জেকশন করা হয়।

প্রচলিত একটি হিসাব অনুযায়ী স্ত্রী মাছের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থির মোট পরিমাণের ৩ ভাগের ১ ভাগ প্রথম ইন্‌জেকশনে এবং অবশিষ্ট ২ ভাগ ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে দ্বিতীয় ইন্‌জেকশনে ব্যবহার করা যায়। আর একটি হিসাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় গ্রন্থির মোট পরিমাণ যত মিলিগ্রাম পরিমাণই স্থির করা হোক না কেন রুই, কাতলা, কালবাউস, সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্পের স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে মাছের দেহের প্রতি কেজি ওজনের জন্য প্রথম ইন্‌জেকশনে গ্রন্থি ব্যবহার করা হয় মাত্র ২ মিলিগ্রাম হিসাবে এবং মৃগেলের ক্ষেত্রে ১—১·৫ মিলিগ্রাম হিসাবে। ৭—৮ ঘণ্টার ব্যবধানে দ্বিতীয় ইন্‌জেকশনে ব্যবহার করা হয় প্রয়োজনীয় গ্রন্থির মোট পরিমাণের অবশিষ্ট অংশ।

গ্রন্থি নির্যাস তৈরীর জন্য গ্রন্থি পেষার সময় কিছু পরিমাণ জল মেশাতে হয়। এই জলের পরিমাণ আগেভাগেই হিসাব করে নিতে হয়। সাধারণত এমন পরিমাণে জল ব্যবহার করতে হয় যাতে ০·১ মিলিলিটার জলে মোটামুটি ১ মিলিগ্রাম পরিমাণ গ্রন্থি মিশ্রিত থাকে বা ১ মিলিলিটার জলে ১০ মিলিগ্রাম গ্রন্থি। তবে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার যেন স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে প্রথম ইন্‌জেকশনে ১ মিলিলিটারের বেশী এবং দ্বিতীয় ইন্‌জেকশনে ২ মিলিলিটারের বেশী জল ব্যবহার করা না হয়।

মাছের দেহের দুটি নির্দিষ্ট জায়গায় ইন্‌জেকশন দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। পুচ্ছ পাখনা (লেজ) ও পৃষ্ঠপাখনার মাঝামাঝি জায়গায় বলিরেখার উপরিভাগের পেশীতে (ইন্ট্রামাসকুলার) অথবা বক্ষপাখনার গোড়ায় মাংসপিণ্ডে (সিলমিক)। পেশীর ইন্‌জেকশনে সিরিঞ্জের সূঁচ প্রথমে মাছের শরীরের সমান্তরাল রেখায় রেখে আঁশের নীচে অল্প প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। তারপর সিরিঞ্জকে মাছের দেহের সঙ্গে ৪৫° ডিগ্রি কোণ করে নিয়ে সিরিঞ্জের ভেতরে নেওয়া গ্রন্থি-নির্যাস মাছের পেশীতে ইন্‌জেকশন করতে হয়। লক্ষ্য

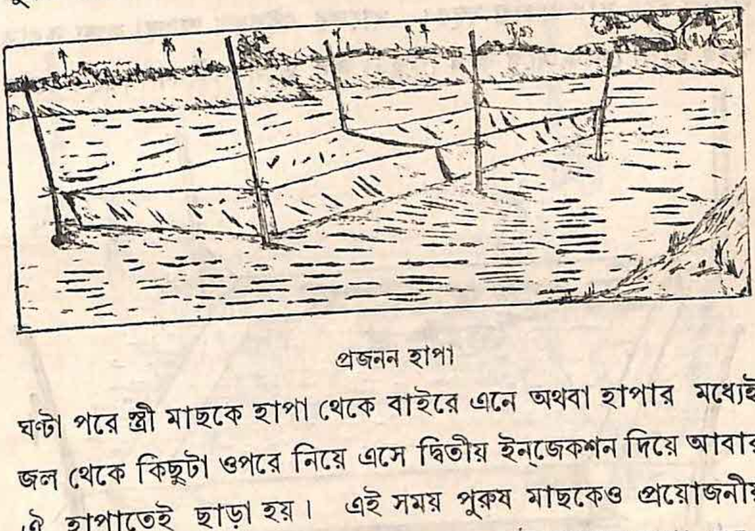
রাখতে হয় যাতে সূঁচ কোনওভাবে আঁশে বিদ্ধ না হয়। এতে মাছ আঘাত পাওয়ার ফলে প্রজনন ব্যাহত হতে পারে। সিলমিক ইন্‌জেকশনে এইরকম অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। বস্তুত এক্ষেত্রে মাছকে হাপার বাইরে আনবারও দরকার হয় না। হাপার ভেতরে জল থেকে সামান্য তুলে নিয়ে হাতের তালুর ওপর রেখে খুব দ্রুত ইন্‌জেকশন দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা যায়। গ্রাস কার্পের ক্ষেত্রে মাছের দেহের সঙ্গে সূঁচের ৯০° ডিগ্রি এবং অন্যান্য প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে ৪৫°—৬০° কোণ করে নিয়ে ইন্‌জেকশন দিতে হয়। গ্রাস কার্পের ইন্‌জেকশনে সূঁচ প্রবেশ করানো হয় ১·০—১·৫ সেন্টি-মিটার ও অন্যান্য মাছের ক্ষেত্রে ১·০ সেন্টিমিটারের মধ্যে দেহের গভীরে। যত নরম হাতে, মাছকে কোনওরকম আঘাত না দিয়ে মাছের প্রায় অজ্ঞাতসারেই ইন্‌জেকশনের কাজটি সমাধা করা যায়, প্রজননে সাফল্যের সম্ভাবনাও তত বেশী।

পুকুর থেকে মাছ ধরার পরপরই মাছকে ইন্‌জেকশন দেওয়া উচিত নয়। কমপক্ষে এক থেকে দু'ঘণ্টা কাল মাছকে হাপায় রেখে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। কাজের নির্ঘণ্ট এমনভাবে তৈরী করা দরকার যাতে ভোরের দিকে বা খুব সকালে (৫টা—৬টার মধ্যে) মাছের ডিম ছাড়ার কাজ শেষ হয়ে যায়।

প্রজনন পদ্ধতি ঃ চাষোপযোগী মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল ও গ্রাস কার্পের প্রজনন পদ্ধতি অভিন্ন। প্রজনন ক্ষেত্রে (পুকুর, নদী বা খাল) পাড়ের দিকে জলে ৪টি বাঁশের খুঁটির সঙ্গে টান্‌টান্ করে বেঁধে প্রজনন হাপা খাটানো হয় মশারীর মতো এমন-ভাবে যাতে হাপার উচ্চতার তিন ভাগের দুভাগ থাকে জলের মধ্যে ও একভাগ জলের ওপরে। হাপার নীচের চাল জলের নীচে মাটি থেকে অন্তত একহাত ওপরে থাকা চাই। প্রজনন হাপা সাধারণত ৩ মিটার × ১½ মিটার × ১ মিটার ও ২ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার সাইজের তৈরী করা হয়। কিছুটা বড় আকারের মাছের জন্য প্রথমোক্ত মাপের হাপা এবং মাঝারি ও ছোট আকারের মাছের

জন্য শেষোক্ত মাপের হাপা ব্যবহার করার দরকার হয়। ঘন মশারির কাপড় অথবা নরম নাইলন দিয়ে এই হাপা তৈরী করা হয়। এটা অবিকল মশারির আকৃতির, তবে ওপর ও নীচ দু'দিকেই চালি থাকে, অর্থাৎ চারদিকই ঘেরা। কেবল ওপরের চালির প্রস্থের একদিকে সেলাই থাকে না। এই খোলা মুখ দিয়ে হাপায় মাছ প্রবেশ করানো ও প্রয়োজনের সময় বাইরে বের করে আনা যায়। খোলা এই দিকটায় ওপর-নীচ করে হাপার গায়ে কয়েকটি ফিতে লাগানো থাকে। হাপার ভেতরে মাছ ছাড়ার পর এই সব ফিতে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে মাছ লাফ দিয়ে হাপার বাইরে আসতে না পারে।

স্ত্রী মাছকে প্রথম ইন্‌জেকশন দিয়ে প্রজনন হাপায় রাখা হয়। পুরুষ মাছকে বিনা ইন্‌জেকশনে পৃথক হাপায় রাখতে হয়। ৭—৮

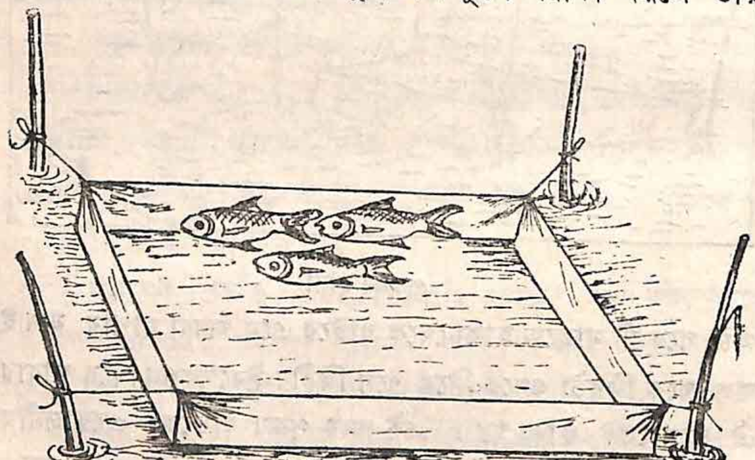


প্রজনন হাপা

ঘণ্টা পরে স্ত্রী মাছকে হাপা থেকে বাইরে এনে অথবা হাপার মধ্যেই জল থেকে কিছুটা ওপরে নিয়ে এসে দ্বিতীয় ইন্‌জেকশন দিয়ে আবার ঐ হাপাতেই ছাড়া হয়। এই সময় পুরুষ মাছকেও প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইন্‌জেকশন দিয়ে স্ত্রী মাছের সঙ্গে একই হাপায় রাখা হয়। কিছু সময় পরেই ইন্‌জেকশনের প্রভাবে উত্তেজিত মাছের রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই অবস্থায় দেখা যায় স্ত্রী মাছ হাপার চারধার দিয়ে ঘুরছে, আর ঠিক পশ্চাতেই পুরুষ মাছ তাকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে চলেছে। উত্তেজনার মাত্রা যত বাড়ে মাছও তত দ্রুত ছোটা-ছুটি করে। উত্তেজনার চরম মুহূর্তে স্ত্রী মাছ নিজের দেহকে লম্বাভাবে

সোজা প্রসারিত করে দিয়ে হাপার চারকোণা বরাবর জলের ওপরে কিছুটা লাফ দিয়ে ওঠে এবং শরীরের ঝাঁকুনি দিয়ে অল্প অল্প পরিমাণে ডিম ছাড়তে আরম্ভ করে। সেই মুহূর্তেই পুরুষ মাছ নিজের দেহ থেকে শুক্ররস বা মিল্ট্ নির্গত করে ঐ ডিমের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে ডিমকে নিষিক্ত করে। এই সময় জলের মধ্যে একটা আলোড়ন ও তা থেকে একটা বিশেষ ধরনের শব্দেরও সৃষ্টি হয়। স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে একই হাপায় রাখার পর থেকে ডিম ছাড়া ও নিষিক্ত হওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে সাধারণত ৪—৬ ঘণ্টা। নক্-আউট মাত্রায় একবার ইন্‌জেকশন দেওয়া হলে, রুই, কাতলা, মৃগেলের ক্ষেত্রে সময় লাগে ৬—৮ ঘণ্টা এবং জাপানী পুঁটির ক্ষেত্রে ৩—৫ ঘণ্টা।

ডিম ছাড়ার পর মাছ অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, চলাফেরার গতিও হয়ে যায় অত্যন্ত মন্থর। মাছের এইরকম অবস্থা লক্ষ্য করার পরই হাপা থেকে মগে করে কিছুটা জল তুলে পরীক্ষা করলে তার

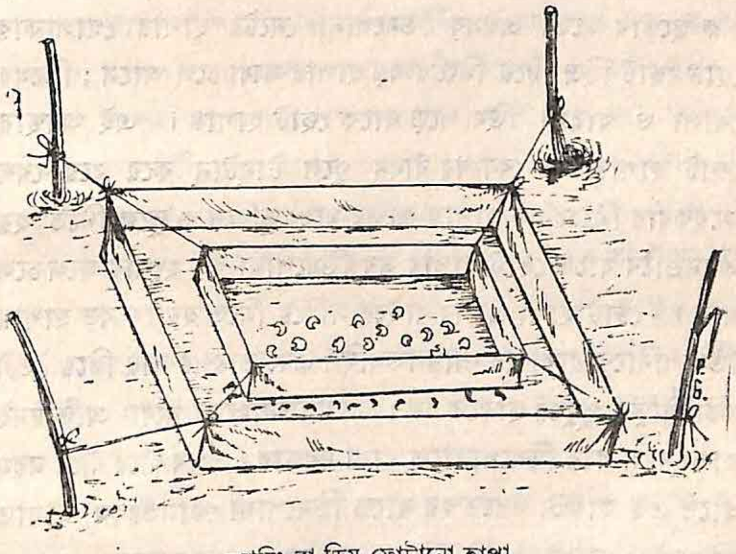


প্রজনন হাপা

মধ্যে সাগুদানার মত অসংখ্য ডিমকে ভাসতে দেখা যায়। খুব সাবধানে হাত-জাল দিয়ে হাপা থেকে সব মাছকে তুলে নিয়ে স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে পৃথক পৃথক পুকুরে ছেড়ে দিতে হয়। চৈত্র মাসে বা বৈশাখ মাসের প্রথমদিকে যে সব স্ত্রী মাছের প্রজনন করানো হয়

উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যা পেলে মরশুমের শেষের দিকে তারা দ্বিতীয়বার প্রজননক্ষম হয়ে ওঠে এবং ডিমও দেয়। আর পুরুষ মাছকে তো উপযুক্তভাবে পরিচর্যা করে একই মরশুমে ১৫—২০ দিন অন্তর কমপক্ষে ৩—৪ বার প্রজননের কাজে ব্যবহার করা যায়। হাপা থেকে মাছ তুলে নেওয়ার পর মগে করে জলসহ ডিম নিয়ে একটা খোলা মুখের হাপায় ২—৩ ঘণ্টা রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে ডিম ফুলে বড় হয়ে মটরদানার আকারের হয় এবং কিছুটা শক্তও হয়। নিষিক্ত ভাল ডিম কাঁচের মত স্বচ্ছ, আর অনিষিক্ত, বাওয়া, খারাপ ডিম অস্বচ্ছ, ঘোলাটে।

এরপর কয়েকটি হ্যাচিং হাপা বা ডিম ফোটানোর হাপা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জলে খাটানো হয়। এই হাপা হয় দু'স্তরের।



হ্যাচিং বা ডিম ফোটানো হাপা

নরম, মসৃণ গোল ফাঁসের নেটের মশারীর কাপড় দিয়ে তৈরী ছোট হাপা—১½ মিটার × ¾ মিটার × ½ মিটার মাপের ও মার্কিন কাপড় (জল চলাচল করতে পারে এমন মানের) দিয়ে তৈরী বড় হাপা—২ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার মাপের। ছোট হাপার ওপর ও নীচে চার কোণে চারটি ফিতে সেলাই করা থাকে। বড় হাপা আগে

খাটিয়ে নিয়ে তার ভেতরে ছোট হাপা বসিয়ে ঐ ফিতে দিয়ে বড় হাপার ভেতর দিকের চার কোণের ফিতের সঙ্গে ও খুঁটির সঙ্গে টান্-টান্ করে এমনভাবে বাঁধা হয় যাতে ছোট হাপার বেশীর ভাগ অংশই ডুবে থাকে বড় হাপার জলের মধ্যে। ভেতর ও বাইরের এই দুরকম হাপারই ওপরে কোন চাল থাকে না, তিনদিক ঘেরা, একদিক খোলা, ফাঁকা—মশারী উল্টোভাবে খাটালে যেমন দেখায়।

এইবার লিটার মগে মেপে ছোট মশারী হাপার ভেতর ডিম দেওয়া হয় সমানভাবে ছড়িয়ে এক বা দু'স্তরে। বাইরে খাটানো বড় হাপার মাপ অনুযায়ী সাধারণত ভেতরের ছোট হাপায় ডিম রাখা হয় ৪০—৫০ হাজার সংখ্যায়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ১৬—১৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে ডিমপোনা বেরিয়ে আসে ডিম থেকে। খুব সরু সুতোর মতো এইসব ডিমপোনা নেটের হাপার গোলাকার ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে নিচের বড় হাপার মধ্যে চলে আসে ; ডিমের খোলা ও খারাপ ডিম পড়ে থাকে ছোট হাপায়। এই অবস্থায় ছোট হাপার চার কোণের বাঁধন খুলে টান্‌টান্ করে ধরে বেশ কয়েকবার নিচের বড় হাপার জলের মধ্যে ডুবিয়ে ও তুলে নিতে হয় এমনভাবে যাতে ছোট হাপার সব ডিমপোনা বড় হাপার জলে চলে যায়। ছোট হাপা এরপর বাইরে সরিয়ে নিতে হয়। বড় হাপায় ডিমপোনাকে রাখা হয় প্রায় তিনদিন এবং তারপর সার দিয়ে তৈরী করা আঁতুড় পুকুরে ছাড়তে হয়। এই তিনদিনের মধ্যে প্রতিদিনই হাপা বদল করে ডিমপোনাকে রাখা দরকার। খুব ধীরে ধীরে নরম হাতে এই কাজটা করতে হয় যাতে ডিমপোনা কোনওরকম আঘাত না পায়। তাছাড়া এই কাজটা করা দরকার খুব সকালে, রোদের তাপ বাড়বার আগে। প্রবহমান নদী বা খালের স্রোতের জলে কিংবা বদ্ধ জলাশয়ে পাম্পের সাহায্যে কৃত্রিম স্রোত সৃষ্টি করে ডিম ফোটানোর ব্যবস্থা করা হলে মশারীর নেটের ছোট হাপা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না, ডিম সরাসরি বড় হাপায় (মার্কিন কাপড়ের) রেখে ফোটানো যায়।

কমন কার্প বা আমেরিকান রুই-এর প্রজনন পদ্ধতিও প্রায় একই ধরনের। তবে সাধারণত এই মাছকে ইন্‌জেকশন দেওয়ার দরকার হয় না। প্রজননক্ষম সুপরিণত স্ত্রী ও পুরুষ মাছ একই সঙ্গে প্রজনন হাপায় ছাড়া হয়। স্ত্রী মাছ স্বাভাবিকভাবে ডিম ছাড়ে ও পুরুষ মাছ সেই ডিম নিষিক্ত করে। তবে যেহেতু এই মাছের ডিম আঠালো সেইজন্য হাপায় কাঁটাঝাঁঝি অথবা কচুরীপানা দেওয়া হয়, সাধারণত স্ত্রী মাছের দেহের ওজনের ৭—৮ গুণ পরিমাণে। হাপায় দেওয়ার আগে ঝাঁঝি বা পানা খুব ভালভাবে কলের জলে (ঝুড়িতে রেখে) ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। আঠালো ডিম ঝাঁঝির ছোট ছোট পাতায়, ডালে অথবা কচুরীপানার পাতায় ও পাতার নীচে ঝোলা দাড়ির মতো লম্বা ঝুরিতে লেগে যায়। ডিম-সমেত ঝাঁঝি বা পানা সরিয়ে নিয়ে ডিম ফোটানো হাপায় রাখা হয়। এই মাছের প্রজনন প্রধানত শীতকালেই করানো হয়। এই সময় জলের তাপমাত্রা খুব কম থাকে, তাই ডিম ফুটে তা থেকে ডিমপোনা বেরিয়ে আসতে সময় লাগে প্রায় ৪৮—৭২ ঘণ্টা। ডিম ফুটে যাওয়ার পর ঝাঁঝি বা পানা হাপা থেকে তুলে ফেলে দিয়ে ডিমপোনাকে পৃথক করে নিয়ে প্রতিদিন হাপা বদল করে তিনদিনের মত সময়কাল হাপায় রাখতে হয় এবং তারপর তৈরী আঁতুড় পুকুরে ছাড়তে হয়। এই মাছের ডিম ফোটানোর জন্য কেবলমাত্র বাইরের মার্কিন কাপড়ের হাপা ব্যবহার করা হয়, নেটের মশারীর হাপা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

বিদেশী সিলভার কার্প মাছের প্রজনন পদ্ধতি অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পদ্ধতিকে স্ট্রিপিং বা ডিম বার করে নেওয়া পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে সব সময়ের জন্যই পৃথক পৃথক হাপায় রাখা হয়, স্ত্রী মাছকে দ্বিতীয় ইন্‌জেকশন দেওয়ার পরেও। স্ত্রী মাছকে প্রথম ইন্‌জেকশন দেওয়ার ১২—১৪ ঘণ্টা ও দ্বিতীয় ইন্‌জেকশন দেওয়ার ৪-৫ ঘণ্টা পর মাছকে হাপা থেকে তুলে পেটের দুপাশে নরমভাবে সামান্য চাপ দিয়ে দেখতে হয় ডিম আলগা–

ভাবে বেরিয়ে আসছে কী না। পেট টিপে ডিম বার করে নেওয়ার উপযুক্ত সময় হলো তখনই যখন পেটের দুপাশে আঙ্গুল দিয়ে সামান্য চাপ দিলেই নলের মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসার মতো মাছের পায়ুদ্বার দিয়ে ডিমের ধারা পড়তে থাকে। আঙ্গুল চালনা করতে হয় মাছের মাথার দিক থেকে পায়ুদ্বারের দিকে। মাছের এইরকম অবস্থা বোঝা ও দেখামাত্রই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে পায়ুদ্বারটা বন্ধ করে নিয়ে মাছটিকে হাপা থেকে খুব সাবধানে ডাঙ্গায় তুলে নিয়ে আসতে হয়। এই সময়ে মাছের দেহে একটা কাঁপুনিভাব লক্ষ্য করা যায় এবং ডিম ছেড়ে দেওয়ার জন্য এমন প্রচণ্ডভাবে ছট্‌ফট্ করে ও শরীরের ঝাঁকুনি দেয় যে অনেক সময় মাছ হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়, মাটির ওপরই বেশীর ভাগ ডিম ছড়িয়ে নষ্ট হয়ে যায় কিংবা ঝাঁকুনির চাপে বুড়ো আঙ্গুল আলগা হয়ে গিয়ে ডিম হাপার মধ্যে বা বাইরে খোলা জায়গায় পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। স্ত্রী মাছকে হাপা থেকে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকটি পুরুষ মাছকেও হাপা থেকে তুলে ডাঙ্গায় এনে একটা জলভর্তি বালতি বা হাঁড়িতে রাখতে হয়। এইবার শুকনো তোয়ালে বা কোন কাপড় দিয়ে মাছের গায়ে লেগে থাকা জল মুছে নেওয়া হয়। স্ত্রী মাছের পেটের দুপাশে হাল্কাভাবে চাপ দিয়ে একটা এনামেলের ট্রে বা গোলাকার গামলা জাতীয় পাত্রে ডিম সংগ্রহ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই একইভাবে পুরুষ মাছের পায়ু-দ্বারের দুপাশে আঙ্গুল দিয়ে কিছুটা চাপ দিয়ে কয়েক ফোঁটা শুক্ররস বা মিল্ট্ বার করে নিয়ে ওই ডিমের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মাছের আকার বড় হলে ও ডিমের পরিমাণ বেশী হলে একাধিক বার পেট টিপে ডিম বার করা যেতে পারে। প্রতিবারই পুরুষ মাছের শুক্ররস দিয়ে ঐ ডিমকে নিষিক্ত করতে হয়। শুক্ররস বার করে নেওয়ার পর পুরুষ মাছকে একটা বড় পাত্রের জলের মধ্যে ছেড়ে রাখলে একাধিক স্ত্রী মাছের ডিম নিষিক্ত করার কাজে ওই একই মাছকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে একাধিক বার ব্যবহার করার ফলে ঐ মাছকে পুকুরে ছেড়ে বাঁচানো যায় না ; তাই ঐ মাছ

বিক্রি করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ডিম বার করে নেওয়ার পর স্ত্রী মাছকেও বিক্রি করে দেওয়া সঙ্গত, কারণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব মাছ পুকুরে ছাড়ার কয়েকদিনের মধ্যে মরে ভেসে ওঠে।

পাত্রে ডিম সংগ্রহ ও ডিমের ওপর শুক্ররস ছড়িয়ে দেওয়ার পর-পরই পাখীর পালক দিয়ে এবং তারপর পাত্রটি হাল্কাভাবে এক থেকে দুমিনিট কাল নাড়াচাড়া করে ডিমের সঙ্গে শুক্ররস ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয়। এরপর খুব ধীরে ধীরে পাত্রের একপাশের গা বেয়ে পরিষ্কার, প্ল্যাংক্টন ও পোকামাকড় থেকে মুক্ত, অক্সিজেনসমৃদ্ধ জল পাত্রে ঢেলে ডিম ধুয়ে নিয়ে পাত্রের অপরিসর একপাশের জায়গা দিয়ে জলটা গড়িয়ে ফেলে দিতে হয় খুবই সতর্ক হয়ে যাতে জলের সঙ্গে ডিম না চলে যায়। ডিমের গায়ে লেগে থাকা বাড়তি শুক্ররস বা মিল্ট্ জলের সঙ্গে এইভাবে বাইরে বার করে দেওয়া হয়। প্রয়োজনে এই ডিম ধোওয়ার কাজ আরও একবার করা যেতে পারে। এরপর একটা খোলা হাপায় ২—৩ ঘণ্টা রাখার পর পূর্বে বর্ণিত দুস্তরের হাপার ভেতরের নেটের মশারীর হাপায় ডিম লিটার মগে মাপ করে রাখা হয় ফোটানোর জন্য এবং রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের মতোই ডিমপোনা তিনদিন হাপায় রেখে তারপর তৈরী করা আঁতুড় পুকুরে ছাড়তে হয়। বিদেশী গ্রাস কার্প মাছ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেশী রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের মতো প্রজনন হাপায় ডিম ছাড়ে এবং ঐ একই হাপায় রাখা পুরুষ মাছের শুক্ররস দ্বারা ঐ ডিম নিষিক্তও হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সিলভার কার্প মাছের মতো হাপা থেকে তুলে বাইরে নিয়ে এলে এই মাছেরও স্ট্রিপিং পদ্ধতিতে ডিম বার করে নিতে হয়।

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের কিছু কিছু প্রগতিশীল মৎস্য-চাষী চীন দেশের অনুকরণে সিমেন্ট, ইটের তৈরী বিশেষ ধরনের হ্যাচারী তৈরী করে প্রজনন ও ডিম ফোটানোর কাজ করছেন। কোনো কোনো খামারে আমেরিকান ও হাঙ্গেরিয়ান মডেলেরও হ্যাচারী ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সব হ্যাচারীতে একই সঙ্গে বহু

সংখ্যক মাছের প্রজনন ও প্রচুর পরিমাণে ডিম ফোটানোর ব্যবস্থা করা যায়। সুবিন্যস্ত পাইপ-লাইনের মাধ্যমে প্রজনন ও ডিম ফোটানোর হ্যাচারীতে ঘূর্ণীয়মান জলস্রোতের সৃষ্টি করে ও প্রয়োজন-মত স্রোতের বেগ নিয়ন্ত্রণ করে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা, জলের তাপমাত্রা, ইত্যাদি সব সময় অনুকূল অবস্থায় রাখা যায়, আবহাওয়ার খামখেয়ালী আনুকূল্যের ওপর নির্ভর করতে হয় না। মাছের প্রজনন কর্মকাণ্ডে নিঃসন্দেহে এটি একটি অতি আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হলেও এই পদ্ধতি বেশ ব্যয়বহুল। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মাণ কাজে বিপুল অর্থ লগ্নীর প্রয়োজন ছাড়াও এই ধরনের হ্যাচারীর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে প্রচুর পরিমাণ প্রজননক্ষম মাছের দরকার হয় এবং সারা বছর ঐ পরিমাণ মাছকে যথোপযুক্ত যত্ন-পরিচর্যা করে সুপরিণত করে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় বহুসংখ্যক বড় আয়তনের পুকুর এবং তাদের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য এক বিরাট কর্মী-বাহিনী। পূর্ব-রেলের মগরা রেলস্টেশনের অনতিদূরে জয়পুর গ্রামে চ্যাটার্জি ব্রাদার্সের আধুনিক মাছচাষের খামারে অতি সাফল্যের সঙ্গে এই জাতীয় হ্যাচারী ব্যবহার করা হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের প্রজনন ও ডিম ফোটানোর কাজে। উৎসাহী ও এই বিষয়ে আগ্রহী মাছচাষীরা এই খামার পরিদর্শন করে হ্যাচারীর নির্মাণ ও পরিচালনার কলাকৌশল সম্বন্ধে অবহিত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

মাছের রোগ—প্রতিরোধ ও প্রতিকার

দেহ থাকলেই একাধিক কারণে মাঝে মাঝে সেই দেহ কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মাছও এই নিয়মের বাইরে নয়। তবে আমাদের সুবিধা এই যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা নিতে পারি রোগের প্রতিকারের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে। মাছ তা পারে না। তাছাড়া জলের মধ্যে বাস করায় বাইরে থেকে জানা বা বোঝাও যায় না মাছের কোন রোগ হয়েছে কী না। পুকুরে জাল দিয়ে ভালভাবে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখার পর রোগ ধরা পড়তে পারে। তাই মাছের বিভিন্ন ধরনের রোগের লক্ষণ এবং রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজের স্বার্থেই মাছচাষীকে অবহিত ও সচেতন থাকতে হবে। রোগগ্রস্ত মাছ ঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে অকালে মারা যেতে পারে। এর ফলে মাছচাষী আর্থিক দিক থেকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আবার, রুগ্ন, দুর্বল মাছ পুকুর থেকে তুলে বিক্রির জন্য বাজারে পাঠালেও মাছচাষী স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম দাম পাবেন।

প্রথমেই জানা দরকার কী কী কারণে মাছ রোগাক্রান্ত হয়। এই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকলে পুকুরে ঐ সব কারণের যাতে সৃষ্টি হতে না পারে তারজন্য সতর্কতামূলক প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং তার ফলে মাছের রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকাও অনেক কমে যায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, যে জলে মাছ বাস করে সেই জলেই মাছের রোগের জীবাণুও বাস করে। কোন কারণে পুকুরের পরিবেশ দূষিত হলে সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই মাছের রোগ-জীবাণুর দ্রুত বংশ বিস্তারের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরকম অবস্থায় মাছ রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রধানত যে যে কারণে মাছের দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলি হলো :

১। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ

২। জলে দীর্ঘদিনব্যাপী ক্রমান্বয়ে অক্সিজেনের অভাব

৩। তলদেশের মাটিতে অতিরিক্ত পাঁক জমার ফলে ক্ষতিকর গ্যাসের (হাইড্রোজেন সালফাইড / কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি) মাত্রাধিক উৎপত্তি ও উপস্থিতি

৪। বাইরে থেকে নোংরা, দূষিত জল পুকুরে প্রবেশ করা

৫। আয়তনের তুলনায় পুকুরে মাত্রাধিক সংখ্যায় ও পরিমাণে মাছ মজুত করা

৬। পুকুরে মজুত মাছের প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের অভাব

৭। মাটির পচন ও বিভাজনের ক্ষমতার অতিরিক্ত পচা-আধপচা গাছের পাতা, উদ্ভিদ, অব্যবহৃত খাদ্যের অংশ ইত্যাদি জৈব পদার্থ মাটিতে সঞ্চিত হওয়া

ওপরে বর্ণিত কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মাত্রাধিক সংখ্যায় বা পরিমাণে পুকুরে মাছ মজুত করা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবজনিত কারণ দুটি ছাড়া অন্যান্য কারণগুলি সবই পুকুরের পরিবেশ এবং জল ও মাটির ভূমিকা সম্পর্কীয়। বস্তুতপক্ষে মাছের অধিকাংশ রোগেরই সূত্রপাত হয় পরিবেশ দূষণের ফলে অথবা পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার ফলে। জলে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে মাছ বাঁচতে পারে না, আবার অক্সিজেনের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ডিমপোনা ও ছোট চারাপোনা 'গ্যাস-বাবল' রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। জলে অতিরিক্ত মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্ব মাছের পক্ষে ক্ষতিকারক, অনেক সময় মাছের মৃত্যুর কারণও বটে, তেমনি আবার কার্বন ডাই-অক্সাইডের অভাবে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং খাদ্যের অভাবে মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। মাছ চাষে সুস্থ, সুসংহত ও সুষম পরিবেশ যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা এই থেকে বোঝা যায়। 'মাছ

চাষের পরিবেশ’ শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং পরিবেশমূলক প্রতিকূল অবস্থা কীভাবে এড়ান যায় সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

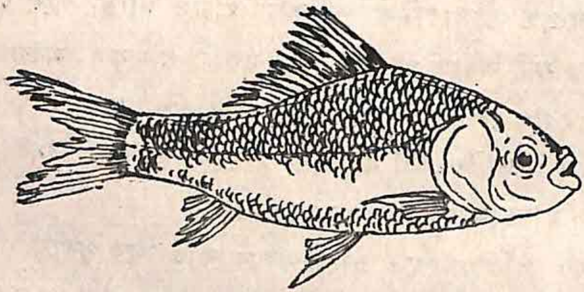
প্রত্যেক পুকুরের নিজস্ব একটা ‘ক্যারিয়িং ক্যাপাসিটি’ বা মাছ-ধারণের ক্ষমতা থাকে। সার দিয়ে এবং পরিপূরক খাদ্য দিয়ে পুকুরের এই ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি করা যায় বটে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। দেখা গেছে ফসফেট সার প্রয়োগ বৃদ্ধি করেও জলে তার পরিমাণ লিটারে ০·২ মিলিগ্রামের বেশী কদাচিৎ পাওয়া যায়, বাড়তি ফসফেটের বেশীর ভাগটাই তলানি হয়ে যায়। নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগের মাত্রা যথেষ্ট বাড়িয়েও জলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ লিটারে ২ মিলিগ্রামের বেশী পাওয়া দুর্লভ ঘটনা। পুকুরের এই মাছধারণ ক্ষমতার মাত্রাধিক সংখ্যায় বা পরিমাণে পুকুরে মাছ মজুত করা হলে একদিকে মাছের খাদ্যাভাবে ও অন্যদিকে জলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাবে মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। আবার, অতিরিক্ত পরিপূরক খাদ্য যোগান দেওয়া যে সবসময় লাভ-জনক হবে তাও বলা যায় না। প্রদত্ত খাদ্যবস্তু মাছ যদি সম্পূর্ণভাবে খেয়ে নিঃশেষ করতে না পারে, তাহলে অব্যবহৃত অংশ তলদেশে জমতে থাকে এবং কিছুদিন এইভাবে জমে থাকার পর পচে জলের অনভিপ্রেত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মাছের পক্ষে ক্ষতিকারক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এই রকম প্রতিকূল অবস্থায় মাছের দেহে রোগ দেখা দেয়। এছাড়াও বাড়তি সার ও খাদ্য ব্যবহারের ফলে যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় মাছের উৎপাদন সেই হারে না বাড়লে মাছচাষ অলাভজনক হয়ে দাঁড়ায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হাতে-কলমে কাজ করে পুকুরের নিজস্ব উৎ-পাদন শক্তি ও মাছধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করাই সর্বাগ্রে দরকার। পুকুরে বেশী সংখ্যায় ছোট মাছ মজুত করা মানেই বেশী উৎপাদন, এটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নয়। এই কথা মনে রেখেই পুকুরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও নিজের

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুকুরে মাছ মজুত করা উচিত এবং প্রয়োজনমত নিয়মিতভাবে পুকুরে সার ও পরিপূরক খাদ্য দেওয়া দরকার। মাঝে মাঝে পুকুরে জাল দিয়ে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেও দেখতে হবে মাছ স্বাভাবিক হারে বাড়ছে কি না। মজুত মাছের সংখ্যা ও পুকুরের মাছধারণ ক্ষমতার মধ্যে সব সময় কিছুটা ব্যবধান রাখা দরকার এবং তার জন্য প্রয়োজনে মাঝে মাঝে কিছু কিছু মাছ ধরে বিক্রি করে বা অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করে পুকুরে মাছের সংখ্যা কমিয়ে দিতে হয়। এইভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করে মাছ চাষ করা হলে মাছের রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা যে বহুলাংশে কমে যায় সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সাধারণত পুকুরে মাছকে যে সব রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায় সেগুলি হলো ঃ

(১) ল্যাজ খসা, পাখনা খসা, আঁশ খসে বা পড়ে যাওয়া রোগ ঃ

রোগের লক্ষণ ঃ পাখনা ও ল্যাজের প্রান্তসীমায় সাদা রেখা ; আক্রান্ত অংশ ফ্যাকাশে সাদা, কিছুটা ফোলাভাব ; ধীরে ধীরে পাখনা ও ল্যাজের ক্ষয়, খেয়ে যাওয়া ভাব এবং খসে পড়া ; চলাফেরায় অক্ষম হয়ে মাছ এই অবস্থায়



লেজ ও পাখনা খসা রোগ

অনেক সময় জলে স্থির হয়ে থাকে, কখনও কখনও ঘুরপাক খায় ; প্রতিদিন সকালে কিছু কিছু মরা মাছ পুকুরে

ভাসতে দেখা যায়। মাছের গায়ের আঁশ দিন দিন ঢিলে বা আলগা হয়ে খসে পড়ে ; ক্রমে আঁশশূন্য হয়ে পড়ায় দেহে ক্ষতের লক্ষণ প্রকাশ পায় ; খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ; মাছ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে মারা যায়।

প্রতিকার : প্রতি কেজি পরিপূরক মাছের সঙ্গে প্রথম ৩ দিন ১০০ মিলিগ্রাম, পরের ২ দিন ৫০ মিলিগ্রাম ও শেষের ২ দিন ২৫ মিলিগ্রাম হিসাবে পরপর ৭ দিন টেরামাইসিন বড়ি খাওয়াতে হয়। বড়ি অল্প জলে গুলে খাদ্যের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। এইসঙ্গে প্রতিদিন বিঘা প্রতি ২০০-২৫০ গ্রাম হিসাবে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট জলে গুলে পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হয় রাতের দিকে। সকালে পরিপূরক খাদ্য দেওয়ার ২-৩ ঘণ্টা পর বিঘা প্রতি ৮-১০ কেজি হিসাবে সাধারণ নুন পুকুরে ৩-৪ দিন ছড়িয়ে দিলে রোগের দ্রুত উপশমে সহায়ক হয়।

(২) কানকোপচা রোগ :

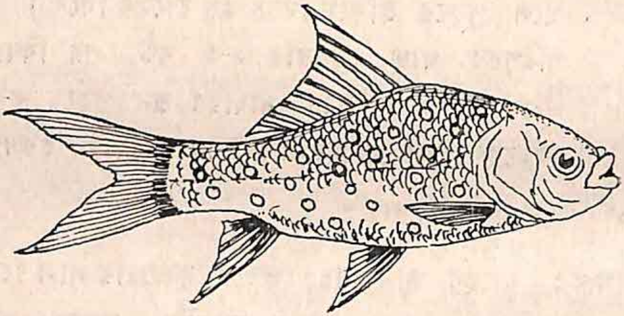
লক্ষণ : মাছের কানকোর ভেতরে ফুলকোর লাল রং ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হয়ে প্রায় সাদা হয়ে যায় ; ফুলকো অকেজো হয়ে পড়ে ; মাছের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় ও মাছ মরতে শুরু করে।

প্রতিকার : ৩% লবণ জলে অর্থাৎ ১০০ ভাগ জলে ৩ ভাগ লবণ মিশিয়ে মাছকে ঐ জলে ৫-১০ মিনিটকাল (যতক্ষণ না মাছ অস্বস্তিবোধ করে) ডুবিয়ে রেখে তারপর পুকুরে ছেড়ে দিতে হয়। ২-৩ দিন অন্তর পুকুরে জাল টেনে মাছ ধরে এইভাবে ২-৩ দিন লবণ জলে ডুবিয়ে পুকুরে ছাড়া হলে রোগের উপশম হয়। প্রয়োজনবোধে চিকিৎসা আরও কয়েকদিন চালাতে হয়। এই সঙ্গে পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী অন্তত ৭ দিন পরপর পুকুরে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট

গোলা জল ছড়িয়ে দিতে হয়।

(৩) **বসন্ত রোগ :**

লক্ষণ : পাখনার, শরীরের অন্যান্য অংশে, বিশেষ করে ফুলকোয়, কিছুটা গোলাকার, কখনও কখনও আলপিনের ডগার মতো ছোট ছোট সাদা দাগ। শীতকালেই সাধারণত এই রোগ দেখা দেয়। শীতকালে খাদ্যের প্রতি মাছের আসক্তি কমে যায়। আর বিশেষ করে কাতলা মাছ পরিপূরক খাদ্য প্রয়োজন মতো খেতে পারে না। তাই কাতলা মাছই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়।



বসন্ত রোগ

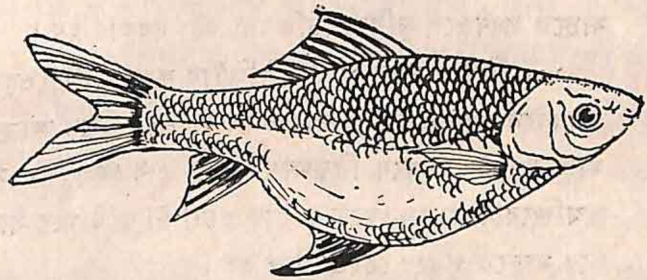
প্রতিকার : নেই বললেই চলে। শীতের আগেই পুকুরে কাতলার চাপ কমিয়ে দেওয়া দরকার। ভাদ্র মাস থেকেই সার হিসাবে কাঁচা গোবরের ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া উচিত। পরিবর্তে সরষের খোল, সুপার ফসফেট ব্যবহার করা যেতে পারে। পৌষ-মাঘ মাস থেকে আবার গোবর ব্যবহার করা যেতে পারে।

আক্রান্ত মাছের বেশীর ভাগটাই বিক্রি করে দেওয়া ভাল। পুকুরের অবশিষ্ট মাছকে ১০০ ভাগ জলে ৫ ভাগ লবণ মিশিয়ে ঐ লবণজলে ২-৩ মিনিট ডুবিয়ে রেখে তারপর পুকুরে ছেড়ে দিতে হয়।

২-৩ দিন অন্তর অন্তত ৩-৪ দিন এইভাবে মাছকে চিকিৎসা করা দরকার। এছাড়া পূর্বে বর্ণিত নিয়মে অন্তত ৭ দিন পুকুরে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট গোলা জল ছড়িয়ে দিলে রোগের উপশমে সহায়ক হয়।

(৪) পেটে জল জমা বা উদরী রোগ ঃ

লক্ষণ ঃ শরীরের বিভিন্ন অংশে জল জমে, বিশেষ করে পেটের অংশটা যেন সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে ; চোখ ঠেলে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে চায় ; আঁশ আলগা হয়ে যায় ; সারা শরীরই যেন ফোলা।



পেটে জল জমা বা উদরী রোগ

প্রতিকার ঃ বেশীর ভাগ রোগাক্রান্ত মাছ বিক্রি করে দিতে হয়। অবশিষ্ট সদ্য বা কম আক্রান্ত এবং আক্রান্ত হয় নি এমন সব মাছকে ৫ পি. পি. এম মাত্রায় (এক লিটার জলে ৫ মিলিগ্রাম) পটাশ পারম্যাঙ্গানেটের জলে ১-২ মিনিট ডুবিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতে হয়। জীবাণুমুক্ত করার জন্য পুকুরের জলেও ১-২ পি. পি. এম মাত্রায় (রোগের অবস্থাভেদে) পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা দরকার।

(৫) কৃমির আক্রমণজনিত রোগ ঃ

লক্ষণ ঃ এক ধরনের চ্যাপ্টা কৃমি মাছের দেহের চামড়ার

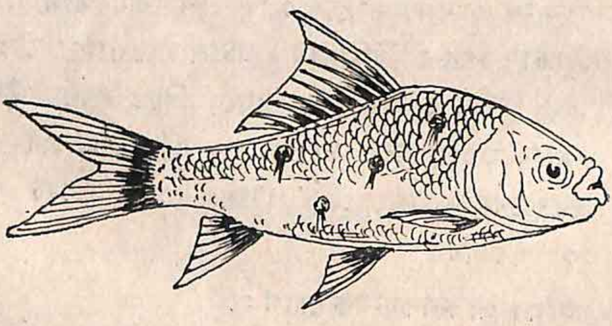
ভেতর, পাখনায় ও ফুলকোয় আশ্রয় নিয়ে বংশ বিস্তার করে। ফুলকোর ওপর ও দেহে অতিরিক্ত লালার ক্ষরণ হয় ; মাছের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় ; মাছ দিন দিন ফ্যাকাশে, বিবর্ণ হয়ে যায়। কৃমির হুল ফোটানোর যন্ত্রণায় মাছ অস্বস্তিতে ছোটাছুটি করে, পুকুরের পাড়ের দিকে এসে গা ঘষে।

প্রতিকার : ৩%-৫% (রোগের অবস্থাভেদে) লবণজলে মাছকে ৩-৫ মিনিট (যতক্ষণ না মাছ অস্বস্তিবোধ করে) ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছেড়ে দিতে হয়। ২-৩ দিন অন্তর আরও ৩-৪ দিন (আরোগ্যের লক্ষণ অনুযায়ী) একই নিয়মে মাছকে লবণজলে ডুবিয়ে চিকিৎসা করা দরকার হয়।

১০০ লিটার জলে ২৫ মিলিলিটার ফরম্যালিন (ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়) ভালভাবে মিশিয়ে নিয়ে আক্রান্ত মাছকে ঐ মিশ্রণে কিছুক্ষণের জন্য (যতক্ষণ না মাছ অস্বস্তিবোধ করে) ছেড়ে রাখলেও চ্যাপ্টা কৃমি মরে যায়। পরে মাছকে পুকুরে ছেড়ে দিতে হয়।

(৬) আরগুলাস্ বা উকুনের আক্রমণজনিত রোগ :

লক্ষণ : মাছের দেহে সুতোর মতো সরু সরু একরকমের উকুন বাসা বাঁধে। তীক্ষ্ণ হুল দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে



আরগুলাস্ বা উকুনের আক্রমণজনিত রোগ

দিয়ে মাছের শরীরের রক্ত শুষে নিয়ে পুষ্ট হয় ও বংশ বিস্তার করে। যন্ত্রণায় মাছ ছট্‌ফট্‌ করে। ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েও মারা যায়। বিশেষ করে রুই মাছ ও গ্রাস কার্পকে এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

প্রতিকার : জলে প্রায় গুলে যায় বিশেষভাবে তৈরী এইরকম ৫০% গ্যামাক্সিন (৬২৫% বি. এইচ. সি-যুক্ত) রোগের প্রকোপ বা অবস্থা অনুযায়ী ০.৫-১.০ পি. পি এম মাত্রায় (এক লিটার জলে ০.৫-১.০ মিলিগ্রাম গ্যামাক্সিন) পুকুরের জলে ব্যবহার করা হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মাছের গা থেকে উকুন খসে পড়ে ও মরে যায়। আই. সি. আই-এর তৈরী এই জাতীয় গ্যামাক্সিন সার বিক্রেতাদের কাছে কিনতে পাওয়া যায়।

ওপরে বর্ণিত মাছের বিভিন্ন রোগ ও তাদের প্রতিকার সম্বন্ধে মাছচাষীকে অবশ্যই জানতে হবে ; কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে খুব কম ক্ষেত্রেই রোগাক্রান্ত সব মাছকে সুস্থ করে তোলা যায়। এর প্রধান কারণ হলো, মাছের জগৎটা প্রায় সব সময়েই আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। জানবার বা বোঝবার আগেই রোগের প্রকোপ এমনভাবে বেড়ে যেতে পারে যে প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েও মাছকে রোগমুক্ত করা সম্ভব হয় না, হয়ত সামান্য সংখ্যার মাছকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যায়। তাছাড়া একবার রোগে আক্রান্ত হলে রোগমুক্ত ও সুস্থ হয়ে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা, খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি নতুন করে শুরু করতে অনেক সময় পার হয়ে যায়। ফলে, মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি দীর্ঘদিন ধরে ব্যাহত হয়ে মাছের সর্বশেষ উৎপাদনও কমে যায়। রোগ প্রতিরোধ রোগ নিরাময়করণের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী ও বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা, এই প্রবাদবাক্য মাছ চাষের ক্ষেত্রে অমোঘ সত্য বলে মেনে নিয়ে মাছচাষীকে এমন দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে

মাছের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে মাছের রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকাও কমে যায়।

সারাংশ

মাছচাষে সাফল্য লাভ করতে হলে মাছের রোগ ও রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মাছচাষীকে অবশ্যই অবহিত হতে হবে এবং রোগাক্রান্ত মাছের দ্রুত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পটাশ পারম্যাঙ্গানেট, গ্যামাক্সিন ইত্যাদি সংগ্রহ করে হাতের কাছে রাখতে হবে। এইসঙ্গে মাছের রোগের কারণগুলি ও রোগ বিস্তারে সহায়ক অবস্থা যাতে পুকুরে সৃষ্টি হতে না পারে সেদিকেও সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার, রোগ প্রতিরোধ রোগ নিরাময়করণের চেয়ে সর্বক্ষেত্রেই অনেক বেশী কার্যকরী ও বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা বলে প্রমাণিত, কারণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কিছু কিছু বা বেশীর-ভাগ মাছকে রোগমুক্ত করা সম্ভব হলেও, মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার সর্বশেষ ফলই হলো মাছের উৎপাদন হ্রাস তথা মাছ-চাষীর লাভের অঙ্কের হ্রাস।

মাছ চাষে অঙ্ক

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান প্রায় সব শাখারই সাহায্য নিতে হয় আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষে। একইভাবে প্রয়োজন হয় অঙ্কশাস্ত্রের কিছুটা জ্ঞান। বিভিন্ন এককে পুকুরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মাপে, আয়তন অনুযায়ী খোল. সারের পরিমাণ নির্ণয়ে, ডিমপোনার চাষ, মিশ্র মাছচাষ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চাষে মাছকে সরাসরি খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় কৃত্রিম খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণে, মাছের রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় ইত্যাদি নানারকম বিষয়ে অঙ্কের সাহায্য নেওয়ার দরকার হয়। মাছচাষীদের সুবিধার্থে তাই এখানে উদাহরণের সাহায্যে কিছু কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হল।

১। **বিভিন্ন এককে মাপ ও ওজন ঃ**

১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার

১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার

১ বিঘা = ১৪৪০০ বর্গফুট

১ কাঠা = ৭২০ বর্গফুট

১ একর = ৩ বিঘা

১ হেক্টর = ২.৫ একর = ৭.৫ বিঘা

০.১ হেক্টর = ১৫ কাঠা

১ ঘনফুট = ২৮৩১৬.৮৫ ঘন সেন্টিমিটার

১০০০ ঘন সেন্টিমিটার = ১ লিটার

১ ঘন মিটার = ১০০০ লিটার

১ ঘনফুট = ২৮.৩২ লিটার

১ কুইন্টাল=১০০ কিলোগ্রাম বা কেজি

১০০০ কিলোগ্রাম=১ মেট্রিক টন

১ পি পি এম=১ লিটার জলে ১ মিলিগ্রাম

২। পুকুরের জলের ঘনত্ব / পরিমাণ নির্ণয় ঃ

(ক) মনে করা যাক, কোনো এক পুকুরের দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার, প্রস্থ ২০ মিটার ও জলের গড় গভীরতা ১ মিটার।

সুতরাং পুকুরের জলের ঘনত্ব=৬০×২০×১ ঘনমিটার

=১২০০ ঘনমিটার

যেহেতু ১ ঘনমিটার=১০০০ লিটার

সুতরাং, পুকুরের জলের পরিমাণ=১২০০×১০০০ লিটার

=১২০০০০০ লিটার

(খ) মনে করা যাক, আর একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট, প্রস্থ ৮০ ফুট ও জলের গড় গভীরতা ৩ ফুট।

সুতরাং জলের ঘনত্ব=১৮০×৮০×৩ ঘনফুট=৪৩২০০ ঘনফুট

যেহেতু ১ ঘনফুট=২৮·৩২ লিটার

অতএব ৪৩২০০ ঘনফুট=৪৩২০০×২৮·৩২ লিটার

=১২২৩৪২৪ লিটার

=পুকুরের জলের পরিমাণ

৩। পুকুর খননে খরচের হিসাব নির্ণয় ঃ

মনে করা যাক, দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট, প্রস্থে ৭২ ফুট ও ৫ ফুট গভীর একটা পুকুর খনন করা হবে।

মাপ অনুযায়ী পুকুরের আয়তন=২০০×৭২ বর্গফুট

=১৪৪০০ বর্গফুট

যেহেতু পুকুরটিকে ৫ ফুট গভীর করা হবে

সেহেতু মোট মাটি কাটার দরকার হবে=১৪৪০০বর্গফুট×৫ফুট

=৭২০০০ ঘনফুট

ধরা যাক, স্থানীয় দর অনুযায়ী প্রতি ১০০০ ঘনফুট মাটি কাটার জন্য মজুরী লাগে ৭০ টাকা,

সুতরাং ৭২০০০ ঘনফুট মাটি কাটার জন্য মজুরী বাবদ খরচ হবে

$$=\frac{৭২০০০ \times ৭০}{১০০০} \text{ টাকা} = ৫০৪০ \text{ টাকা।}$$

একই নিয়মে পুরনো পুকুর সংস্কার বা ঝালাই করার জন্য পাঁক-মাটি কাটা ও তোলার খরচের হিসাব করে নেওয়া যায়।

৪। মহুয়া খোলের পরিমাণ নির্ণয় ঃ

(ক) মনে করা যাক, কোনো একটি পুকুরের জলের আয়তক্ষেত্রটি এইরকম ঃ

দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট, প্রস্থ ৭২ ফুট ও জলের গড় গভীরতা ৩ ফুট।

এই মাপ অনুযায়ী জলের আয়তন = ২০০ × ৭২ বর্গফুট

= ১৪৪০০ বর্গফুট = ১ বিঘা।

প্রতি বিঘা জলকরে প্রতি একফুট জলের গভীরতার জন্য মহুয়া খোলের প্রয়োজন হয় ১০০ কেজি।

সুতরাং আলোচ্য পুকুরে ব্যবহারের জন্য মহুয়া খোলের প্রয়োজন হবে = ১ × ৩ × ১০০ কেজি = ৩০০ কেজি।

(খ) মনে করা যাক, অন্য আর একটি পুকুরের জলের আয়তন ৬০০০ বর্গফুট এবং জলের গভীরতা (গড়) ৩ ফুট।

আমরা জানি ১ কাঠা = ৭২০ বর্গফুট

সুতরাং ৬০০০ বর্গফুট = $\frac{৬০০০}{৭২০}$ কাঠা = ৮·৩ কাঠা

প্রতি কাঠা জলকরে প্রতি একফুট গভীরতার জন্য মহুয়া খোলের প্রয়োজন হয় ৫ কেজি।

সুতরাং ৮·৩ কাঠা জলকরে ৩ ফুট জলের গভীরতার জন্য মহুয়া খোল ব্যবহারের প্রয়োজন হবে = ৮·৩ × ৩ × ৫ কেজি

= ১২৪·৫ কেজি বা ১২৫ কেজি।

৫। **মাছের রোগে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় ঃ**

মনে করা যাক, ২ নং উদাহরণের (খ) পুকুরের মাছ আরগুলাস বা উকুন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মাছকে রোগমুক্ত করার জন্য গ্যামাক্সিন ব্যবহার করতে হবে('মাছের রোগ-প্রতিরোধ ওপ্রতিকার' শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। বর্ণিত পুকুরের জলের পরিমাণ ১২২৹৪২৪ লিটার। রোগের অবস্থা অনুযায়ী গ্যামাক্সিনের মাত্রা ১ পি পি. এম স্থির করা হলে (১ লিটার জলে ১ মিলিগ্রাম গ্যামাক্সিন) পুকুরের ১২২·৪২৪ লিটার জলের জন্য গ্যামাক্সিন্ ব্যবহারের প্রয়োজন হবে ১২২৩৪২৪ মিলিগ্রাম বা ১২২৩ গ্রাম। রোগের অপেক্ষাকৃত কম প্রকোপে ০৫ পি. পি. এম মাত্রায় গ্যামাক্সিন ব্যবহার করা হলে গ্যামাক্সিনের পরিমাণ হবে ১২২৩৪২৪ × ০৫ মিলিগ্রাম অর্থাৎ ৬১১৭১২ মিলিগ্রাম বা ৬১২ গ্রাম।

৬। **পুকুরে ছাড়ার জন্য ডিমপোনার সংখ্যা নির্ণয় ঃ**

আঁতুড় পুকুরে ছাড়ার জন্য ডিমপোনা সংগ্রহ করা হয় (ক) বাঁকুড়া জেলার বাঁধ থেকে (খ) নদীর ঘাট, আড়ত থেকে ও (গ) প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতিতে উৎপাদিত ডিমপোনা কোনো সরকারী বা বেসরকারী মাছের খামার থেকে। এইসব সংগ্রহ ও বিক্রয়কেন্দ্রে ডিমপোনা মাপবার প্রকরণ ও পদ্ধতি দুই-ই বিভিন্ন আকার ও প্রকারের।

বাঁকুড়ায় বাঁধের ডিমপোনা মাপা হয় ছোট একটি ঢাকনি দিয়ে। এর প্রচলিত নাম ডিবা। বলা হয় এক ডিবায় ৩ দিন বয়সের ডিমপোনা ধরে ১০০০টি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক ডিবায় গড়ে ৭৫০টির বেশী ডিমপোনা পাওয়া যায় না। নদীর ডিমপোনা ও প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতিতে বেসরকারী খামারে উৎপাদিত ডিমপোনা বিক্রির জন্য মাপ করা হয় ছোট সাইজের অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে। এই রকম ৪ বাটি ডিমপোনার একককে

বলা হয় এক কুনকা। প্রতি বাটিতে ৫০ হাজার হিসাবে এক কুনকা ডিমপোনার সংখ্যা ধরা হয় ২ লক্ষ। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মাপের বাটিতে ডিমপোনার সংখ্যা পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক বাটিতে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫-৪০ হাজারের মধ্যে, কারণ ডিমের সঙ্গে বাটিতে কিছু পরিমাণ জল অনিবার্যভাবেই থাকে। সরকারী খামারে ডিমপোনা বিক্রি হয় সি. সি. হিসাবে। ৩ দিন বয়সের ১ সি সি. মাপের কোন পাত্রে ডিমপোনা ধরে ৫০০টি মতো গড়ে। এই হিসাবে ১০০ সি. সি. মাপে ডিমপোনা পাওয়া যাবে ৫০ হাজার সংখ্যায়।

৭। ডিম ফোটানোর জন্য হাপায় দেওয়া ডিমের সংখ্যা নির্ণয়ঃ

ডিম ফোটানোর জন্য ডিম রাখা হয় হাপাতে। সাধারণত ২ মিঃ×১ মিঃ×১ মিঃ সাইজের মার্কিন কাপড়ের বাইরের হাপা ও $1\frac{1}{2}$ মিঃ×$\frac{3}{4}$ মিঃ×$\frac{1}{2}$ মিঃ সাইজের ভেতরের নেটের মশারীর কাপড়ের হাপা ব্যবহার করা হলে হাপায় ডিম রাখা হয় ৪০-৫০ হাজার সংখ্যায়। এই সংখ্যা নির্ণয় করা হয় মাপের সাহায্যে।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিক্রির দোকানে গ্রাজুয়েটেড এনামেলের লিটার মগ কিনতে পাওয়া যায়। এর বাইরের গায়ে ১০টা সমান-ভাবে ভাগ করা দাগ কাটা থাকে। দশ দাগ পর্যন্ত ভর্তি করে ডিম তোলা হলে কিছুটা জলসমেত যে পরিমাণ ডিম মগে ধরে হিসাব করে দেখা গেছে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫-১৬ হাজার, এক দাগে ১৫০০-১৬০০। জলশূন্য অবস্থায় মগভর্তি করা হলে ডিম ধরে প্রায় ২০ হাজার। কিন্তু বাস্তবে এই পরিমাণ ডিম তোলা সম্ভব নয়, কারণ জলছাড়া শুকনো অবস্থায় ডিমকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যও রাখা ডিমের পক্ষে মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। এই হিসাব অনুযায়ী মগে মাপ করে নির্দিষ্ট সংখ্যায় ডিম হাপায় রাখা হয় ডিম থেকে ডিমপোনা উৎপন্ন করার জন্য।

৮। মাছের ওজন, ডিম ও ডিমপোনার মধ্যে সম্পর্ক ঃ

বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ডিমধারণের ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। ডিমধারণের এই ক্ষমতা হলো, প্রতি এক কেজি দেহের ওজনে প্রজননক্ষম, সুপরিণত স্ত্রী মাছের পেটে যে পরিমাণ ডিম জন্মাতে পারে। যেমন—

চাষোপযোগী মাছ	ডিমধারণের ক্ষমতা
(ক) কাতলা	৮০ হাজার
(খ) রুই	২ লক্ষ
(গ) মৃগেল	১৫ লক্ষ
(ঘ) সিলভার কার্প	২ লক্ষ
(ঙ) গ্রাস কার্প	৭০-৮০ হাজার
(চ) কমন কার্প (আমেরিকান রুই)	১.০-১.২৫ লক্ষ

এই হিসাব থেকে বলা যায় যে একটি এক কেজি ওজনের সুস্থ, সবল, প্রজননক্ষম, সুপরিণত রুই স্ত্রী-মাছ যদি সম্পূর্ণভাবে ডিম ছাড়তে পারে তাহলে ২ লক্ষ সংখ্যক ডিম পাওয়া সম্ভব। প্রজনন ক্রিয়ায় ব্যবহৃত পুরুষ-মাছ উপযুক্তভাবে এই ডিমকে নিষিক্ত করলে ভাল ডিমের সংখ্যার হার ৮০% পর্যন্ত হতে পারে। তবে গড় হিসাবে এই হার ৬০% ধরাই বাস্তবসম্মত। এই হিসাব অনুযায়ী ২ লক্ষ ডিম থেকে নিষিক্ত ভাল ডিম পাওয়া যেতে পারে ১ লক্ষ ২০ হাজার সংখ্যায়। ডিম ফোটানোর কাজে ১৬-১৮ ঘণ্টা হাপায় থাকা অবস্থায় স্বাভাবিক কারণে এবং নাড়াচাড়া ইত্যাদি অন্যান্য কারণে কিছু সংখ্যক ডিম নষ্ট হয়ে যায়। এই ক্ষয়ক্ষতি বাদে, কোন দুর্বিপাক বা দুর্ঘটনা না ঘটলে, ডিম ফোটার পর যে ডিমপোনা পাওয়া যায় তার হার দাঁড়ায় ৬০%-৮০%। এই হিসাব মতে ১ লক্ষ ২০ হাজার নিষিক্ত ভাল ডিম থেকে ৭২-৯৬ হাজার সংখ্যক ডিমপোনা পাওয়া যেতে পারে। রুই ও সিলভার কার্পের ডিম-ধারণের ক্ষমতা একইরকম। সুতরাং একটি এক কেজি ওজনের সিলভার

কার্প থেকেও ৭২-৯৬ হাজার সংখ্যক ডিমপোনা পাওয়া যায়। এই ভাবে একটি ২ কেজি ওজনের কাতলা মাছ থেকে ৫৮-৭৭ হাজার ও একটি ৫০০ গ্রামের মৃগেল মাছ থেকে ২৭-৩৬ হাজার ডিমপোনা পাওয়া যেতে পারে। প্রণোদিত প্রজনন কাজের কর্মসূচী গ্রহণে যারা আগ্রহী, বর্ণিত হিসাবের ভিত্তিতে তারা কাজের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে সেই অনুযায়ী কাজের পরিকল্পনা তৈরী করতে পারেন।

৯। ডিমপোনা চাষে পরিপূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয়ঃ

মনে করা যাক, বিঘা প্রতি ৩ লক্ষ হিসাবে একটি ১০ কাঠা আয়তনের আঁতুড় পুকুরে ১.৫ লক্ষ ডিমপোনা ছাড়া হয়েছে। ডিমপোনাকে প্রতিদিন বাইরে থেকে যে পরিপূরক খাদ্য (সরষের খোল ও চালের কুঁড়ো / গমের ভূষি) দিতে হবে তার পরিমাণ হিসাব করে নিতে হয় এইভাবেঃ

সাধারণতঃ ৩ দিন বয়সের যে ডিমপোনা পুকুরে ছাড়া হয় সেইরকম ১ লক্ষ ডিমপোনার ওজন হয় ১৪০ গ্রাম। এই হিসাবে ১.৫ লক্ষ ডিমপোনার ওজন হবে ২১০ গ্রাম।

(ক) প্রথম ৫ দিন পরিপূরক খাদ্য দিতে হয় ডিমপোনার দেহের ওজনের ৩-৪ গুণ হিসাবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ হবে ২১০ গ্রামের ৩-৪ গুণ বা ৬৩০-৮৪০ গ্রাম। মনে করা যাক, ৮৪০ গ্রাম খাদ্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ৮৪০ গ্রামের এই খাদ্যবস্তুটি তৈরী করা যেতে পারে এইভাবেঃ

সরষের খোলের গুঁড়ো ৪২০ গ্রাম ও চালের কুঁড়ো ৪২০ গ্রাম —এই দুটি ভালভাবে মিশিয়ে অথবা ৪২০ গ্রাম সরষের খোলের গুঁড়োর সঙ্গে ৪২০ গ্রাম গমের ভূষি (মিহি করে নিয়ে) মিশিয়ে অথবা ৪২০ গ্রাম সরষের খোলের সঙ্গে ২১০ গ্রাম চালের কুঁড়ো ও ২১০ গ্রাম গমের ভূষি মিশিয়ে।

(খ) পরের ৫ দিন খাদ্য দিতে হয় ডিমপোনার ওজনের (পুকুরে ছাড়ার সময়) ৫-৬ গুণ হিসাবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে দৈনিক মোট

খাদ্যের পরিমাণ হবে ২১০ গ্রামের ৫-৬ গুণ, অর্থাৎ, ১০৫০ – ১২৬০ গ্রাম।

(গ) এরপর থেকে খাদ্য দিতে হয় ডিমপোনার ওজনের ৮-১০ গুণ হিসাবে। সুতরাং এইক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ (দৈনিক) হবে ১৬৮০-২১০০ গ্রাম।

১০। মিশ্র মাছচাষে পরিপূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় ঃ

মনে করা যাক, একটি ২ বিঘা আয়তনের পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ২০০০ চারাপোনা মজুত করা হয়েছে এইরকম অনুপাতে— কাতলা ২০০, সিলভার কার্প ৪০০, রুই ৬০০, গ্রাস কার্প ২০০, মৃগেল ৩০০ ও কমন কার্প ৩০০। মাছ ছাড়ার সময় প্রতিটি প্রজাতির মাছের শতকরা ১০টির ওজন নিয়ে পুকুরে মজুত করা মাছের মোট ওজন নির্ণয় করা হলো। মনে করা যাক, এই ওজন দাঁড়ায় ৬০ কেজি (গ্রাস কার্পের ওজন বাদে)। মাছের দেহের ওজনের শতকরা ২ ভাগ পরিপূরক খাদ্য দেওয়া স্থির করা হলে এক্ষেত্রে ৬০ কেজির ২% হিসাবে অর্থাৎ দৈনিক ১২০০ গ্রাম হিসাবে খাদ্য দেওয়া শুরু করতে হবে।

একমাস পর পুকুরে জাল দিয়ে আগের মতো প্রতিটি প্রজাতির মাছের শতকরা ১০টি মাছের (নির্বাচন না করে ছোটবড় সবরকম সাইজের) ওজন নিয়ে তা থেকে ঐ দিন পুকুরে মজুত মাছের মোট ওজন নির্ণয় করা হলো। দেখা গেল, ৪০টি সিলভার কার্পের (পুকুরে ছাড়া ৪০০টি মাছের ১০%) মোট ওজন হয়েছে ২৪০০ গ্রাম, অর্থাৎ, সিলভার কার্পের প্রতিটি মাছের গড় ওজন ৬০ গ্রাম। এই হিসাবে পুকুরে মজুত করা ৪০০টি সিলভার কার্পের মোট ওজন ধরা যেতে পারে ২৪ কেজি। এইভাবে পুকুরের অন্যান্য প্রজাতির মাছের পৃথক পৃথক ভাবে মোট ওজন নির্ণয় করা হলো। হিসাব করে দেখা গেল ওই দিনে পুকুরে মজুত মাছের (গ্রাস কার্প বাদে) মোট ওজন দাঁড়িয়েছে ১৫০ কেজি। এই হিসাব অনুযায়ী পরের দিন থেকে পরবর্তী একমাস

সময়ে মাছকে পরিপূরক খাদ্য খাওয়াতে হবে দৈনিক ১৫০ কেজির শতকরা ২ ভাগ হিসাবে, অর্থাৎ ৩ কেজি হিসাবে। প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট তারিখে পুকুরে জাল দিয়ে এইভাবে মজুত মাছের মোট ওজন নির্ণয় করে নিয়ে পরবর্তী একমাসের জন্য দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ স্থির করতে হবে।

গ্রাস কার্পের ক্ষেত্রে গ্রাস কার্পের মোট ওজনের সমপরিমাণ কাঁটা ঝাঁঝি বা ঘাস খাদ্য হিসাবে দৈনিক পুকুরে দিয়ে শুরু করতে হবে। খাদ্যের সদ্ব্যবহারের প্রকৃতি বুঝে খাদ্যের পরিমাণ প্রয়োজন মতো বাড়াতে বা কমাতে হবে।

মাছচাষে কিছু টোটকা ও টুকিটাকি

১। নদীর ডিমপোনায় রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি চাষোপযোগী মাছের পোনা ছাড়াও নানা জাতের আমাছা ও মাছ-খেকো মাছের ডিমপোনাও থাকে। এত ছোট অবস্থায় এদের চিনে নেওয়া বেশ শক্ত। তবুও কয়েকটা লক্ষণ দেখে মোটামুটি ধারণা করা যায়।

একটি প্লেট বা থালায় জলসমেত কিছু ডিমপোনা নিয়ে তাদের চলাফেরার দিকে ভালভাবে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে, কিছু ডিমপোনা ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে ঘুরছে। রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস মাছের চলনের গতিপথ এইরকম। কী পরিমাণ ডিমপোনা এইভাবে ঘড়ির কাঁটার চলার বিপরীত দিকে ঘুরছে তা লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে ডিমপোনার মধ্যে এই জাতীয় মাছের ভাগ বা অংশ কতটা। আরও ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এইসব ডিমপোনার জলে অবস্থানকালে নিজেদের মধ্যে একটি স্তরভেদ আছে—পরপর তিনটি পৃথক স্তরে এরা ঘুরছে। এত ছোট অবস্থাতেও (৩-৪ দিন বয়সের) নিজেদের স্বভাবগত ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জলে এরা ওপর (কাতলা), মাঝ (রুই) ও নীচের স্তরে (মৃগেল ও কালবাউস) চলাফেরা করে। এই থেকে ডিম-পোনার মধ্যে কোন্ প্রজাতির মাছের ভাগ বা অংশ কতটা সে সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা করা যায়।

২। ডিমপোনা ছাড়ার দিন সকালে (ছাড়ার ৫-৬ ঘণ্টা আগে) সরষের খোল জলে গুলে আঁতুড় পুকুরে ছড়িয়ে দিলে ডিমপোনা বাঁচার এবং ধানিপোনা ও চারাপোনার উৎপাদনের হার নিঃসন্দেহে খোল ব্যবহার করা হয় নি এমন আঁতুড় পুকুরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত

বেশী হয়। বিঘা প্রতি জলকরে ১২-১৬ কেজি খোল ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। মহুয়া খোল বা গোবর দিয়ে পুকুর তৈরী করা হলে পুকুরের জলের রং দেখেও কিছুটা ধারণা করা যায় পুকুর মাছ ছাড়ার মতো উপযুক্তভাবে তৈরী হয়েছে কী না। জলের রং চায়ের লিকারের মতো দেখালে বুঝতে হবে পুকুরে জু-প্ল্যাংকটন বা প্রাণিজ খাদ্যাণুর সৃষ্টি হয়েছে এবং এই জাতীয় খাদ্যাণুরই প্রাধান্য আছে। হালকা বা ফিকে সবুজ রংও প্ল্যাংকটনের অস্তিত্বের নিদর্শন, কিন্তু এক্ষেত্রে ফাইটো-প্ল্যাংকটন বা উদ্ভিদ খাদ্যাণুর প্রাধান্য থাকতে পারে।

৪। সবসময় ঘোলা, সাদাটে বা মেটে রং-এর জলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন ভাল হয় না। এইসব পুকুরের উৎপাদিকা শক্তি খুবই কম। এইরকম পুকুরে ঘন ঘন এবং একটু বেশী পরিমাণে চূণ ব্যবহার করে সার দিতে হয়, মাটি ও জলের সংশোধনের জন্য।

৫। প্ল্যাংকটন বা খাদ্যাণুর পরিমাণ নির্ণয় ও গুণগত বিচারের জন্য পুকুর থেকে প্ল্যাংকটন সংগ্রহ করতে হয় খুব সকালে, সূর্যোদয়ের পরপরই।

৬। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ও জলের পি. এইচ নির্ধারণ করতে হলে জলের নমুনা দিনের অন্য সময়ে ছাড়াও অবশ্যই ভোরের দিকে একবার সংগ্রহ করা দরকার।

৭। পি. এইচ-এর মান যত বেশী, দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রাও তত বেশী। পি. এইচ-এর মান যত কম, অক্সিজেনের মাত্রাও তত কম।

৮। রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হয় পুকুরের তলদেশের কমপক্ষে ৫-৬ জায়গা থেকে অল্প অল্প পরিমাণে মাটি সংগ্রহ করে এবং পরে সবকটি নমুনা একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে। মাটির নমুনা কমপক্ষে ২৫০-৩০০ গ্রাম পরিমাণের হওয়া দরকার।

সংগ্রহের পরপরই নমুনা রাখতে হয় একটি পলিথিনের কৌটায় মুখ বন্ধ করে, অভাবে পলিথিনের কাগজে জড়িয়ে অন্য কোন পাত্রে মুখবন্ধ অবস্থায়। কোনো অবস্থাতেই রোদের সংস্পর্শে মাটির নমুনা রাখা উচিত নয়।

জলের নমুনা সংগ্রহ করতে হয় অন্তত এক লিটার পরিমাণে। একটি রঙীন শিশি বা বোতল ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে মুখ বন্ধ অবস্থায় যতটা সম্ভব গভীরজলে (হাত যতদূর পৌঁছতে পারে) ডুবিয়ে জলের মধ্যেই মুখের ঢাকনি খুলে দিতে হয়। জল ভর্তি হয়ে গেলে জলের মধ্যেই ঢাকনি দিয়ে মুখ বন্ধ করে তারপর শিশি বা বোতলকে জলের বাইরে আনতে হবে। এতে বাইরের বাতাস শিশি বা বোতলের জলের সঙ্গে মিশতে পারে না।

নমুনা খুব সকালে সংগ্রহ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরীক্ষাগারে পৌঁছে দিতে হবে যাতে ওই দিনের মধ্যেই জলের বিশ্লেষণের কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। মাটির বিশ্লেষণের কাজে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে।

৯। খোল বা গোবর দেওয়ার পর ২-৩ দিন অন্তর পুকুরে ঘাটাল দিলে, জাল টেনে বা লোক দিয়ে, পুকুরের স্বাভাবিক অবস্থা তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, পুকুর দ্রুত মাছ ছাড়ার মতো উপযুক্তভাবে তৈরী হয়ে যায়।

১০। পরিপূরক কৃত্রিম খাদ্যের সঙ্গে অতি সামান্য মাত্রায় কোবাল্ট ক্লোরাইড (রাসায়নিক পদার্থ) মিশিয়ে মাছকে খাওয়ালে মাছের বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। বিশেষ করে ডিম-পোনা ও চারাপোনার চাষে ব্যবহার করা হলে বৃদ্ধির হার ২৫-৩০ শতাংশ বাড়তে দেখা গেছে। এক কেজি খাদ্যের সঙ্গে মাত্র ৩ মিলিগ্রাম কোবাল্ট ক্লোরাইড ব্যবহারেই সুফল পাওয়া যায়।

১১। জাভার পুঁটির (জাপানী পুঁটি নামে পরিচিত) চাষে খাদ্য হিসাবে কাঁটা ঝাঁঝি, পাটা ঝাঁঝি, ঘাস ইত্যাদি নরম উদ্ভিদ (কুচিয়ে ছোট ছোট আকারে) পুকুরে দেওয়া দরকার মাছের পুষ্টি

ও বৃদ্ধির জন্য।

১২। ইউরিয়া সরাসরি পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হয়, সুপার ফসফেট বাইরে কোনো পাত্রে জলে গুলে নিয়ে।

১৩। বিক্রি করা বা অন্য পুকুরে হিসেব করে ছাড়ার সময় চারাপোনার সংখ্যা একটি একটি করে গুনে ঠিক করা সম্ভব হয় না। একটি ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ভর্তি করে (যতদূর সম্ভব অল্প জলে) চারাপোনা নিয়ে বাটির সব মাছ একটি একটি করে গুনে নেওয়া যায়। এইভাবে আর এক বাটি মাছ গুনে দুবারের গড় নিয়ে এক বাটি চারাপোনার সংখ্যা জানা যায় এবং এই হিসেব অনুযায়ী বাটি মেপে চারাপোনা বিক্রি করা বা অন্য পুকুরে নির্দিষ্ট সংখ্যায় ছাড়া যায়। বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ১০০ গ্রাম পরিমাণ চারাপোনা (যতটা সম্ভব অল্প জলসহ) ওজন করে এবং একটি একটি করে গুনে নিয়ে ১০০ গ্রাম চারাপোনার সংখ্যা জেনে ওজনের মাধ্যমে বিক্রি করা বা অন্য পুকুরে সঠিক সংখ্যায় ছাড়া যায়।

১৪। পুকুর থেকে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবহন না করে চারাপোনাকে কমপক্ষে ২-৩ ঘণ্টা পুকুরের জলে কাপড়ের হাপায় রেখে মাঝে মাঝে হাপার ভেতরে জল ছিটিয়ে কিছুটা ব্যায়াম করানো দরকার। হাপায় ছোট জায়গায় নতুন করে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য খাওয়ার সুযোগ না থাকায় মলত্যাগের সঙ্গে ধীরে ধীরে চারাপোনার পেট খালি হয়ে যায়, চারাপোনা কিছুটা শক্ত ও পরিবহনযোগ্য হয়ে ওঠে, বড় জায়গা থেকে হঠাৎ ছোট জায়গায় এসে আবদ্ধ হওয়ার দরুণ তাদের মধ্যে যে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি হয় তা তারা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে পারে। এরপর খোলা হাঁড়িতে বা অক্সিজেন প্যাকিং-এ মুখআঁটা টিনে পরিবহনের সময় তারা ঐ ছোট জায়গার মধ্যেও স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে, পেট খালি থাকায় মলত্যাগে জল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং এর ফলে চারাপোনার পরিবহনজনিত সম্ভাব্য মৃত্যুর হার অনেক কমে যায়।

১৫। চারাপোনা পরিবহনের মাধ্যম হিসাবে যে জল ব্যবহার

করতে হয় তাতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা যেমন বেশী থাকা দরকার, তেমনি আবার সেই জল অবশ্যই প্ল্যাংকটনবিহীন ও পোকা-মাকড় থেকে মুক্ত হওয়া চাই। এরজন্য পুকুরের জল ব্যবহার করা হলে সেই জল কাপড়ে ভালভাবে ছেঁকে নেওয়া উচিত।

১৬। কোন কোন পুকুরে চুলের মত সরু সরু, সবুজ রং-এর অত্যন্ত পিচ্ছিল এক জাতীয় শেওলা (ফিলামেণ্টাস অ্যালগি) জন্মাতে দেখা যায় এবং এরা খুব দ্রুত পুকুরের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। জাল টেনে এদের নির্মূল করা যায় না, লোক দিয়েও পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায়, বিশেষ করে চারা বা ছোট মাছ থাকলে, জাল টানাও বিপদজনক; কারণ জালের ভেতর আটকানো মাছ এই শেওলায় জড়িয়ে পড়ে মারা যায়। এইরকম অবস্থায় পুকুরে কিছু সংখ্যায় মাঝারি আকারের (৪০০-৫০০ গ্রাম) গ্রাস কার্প ছাড়া হলে অল্প দিনের মধ্যে শেওলা নির্মূল হয়ে যায়, পুকুরে আবার জাল টানা যায়।

অগভীর কোন কোন পুকুরে কাঁটা ঝাঁঝি জন্মায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে বেড়ে সারা পুকুর ঢেকে ফেলে। এইসব পুকুরেও গ্রাস কার্প মাছ ছেড়ে এই অবাঞ্ছিত জলজ উদ্ভিদকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তা ছাড়া খাদ্য হিসাবে এই ঝাঁঝি খেয়ে গ্রাস কার্প মাছের ওজনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

১৭। কাঁচা গোবর ও সরষের খোল ৬০ : ৪০ অনুপাতে (ওজনে) ভালভাবে মিশিয়ে মেখে নিয়মিতভাবে দেড়-দু'মাস খেতে দিলে কমন কার্প বা আমেরিকান রুই মাছ দ্রুত প্রজননক্ষম ও সুপরিণত হয়। মজুত মাছের শরীরের ওজনের শতকরা ৮-১০ ভাগ পরিমাণে বর্ণিত খাদ্যবস্তু দিতে হয় পুকুরের চারকোণে কিছুটা শক্ত মণ্ডাকারে সবচেয়ে কম গভীরজলে এমনভাবে যাতে খাদ্যবস্তুটি তাড়াতাড়ি জলে গুলে না যায় এবং মাছ সরাসরি খেয়ে নিতে পারে।

১৮। শীতকালই কমন কার্পের প্রজননের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলেও খুব বেশী শীতের সময় এই কাজে আশানুরূপ ফল

পাওয়া যায় না। মাছ ডিম দিলেও জলের তাপমাত্রা খুব কম থাকায় ডিম ফুটে ডিমপোনা উৎপন্ন হতে অনেক বেশী সময় লাগে, কখনও কখনও ৭২ ঘণ্টারও বেশী। এর ফলে এই দীর্ঘ সময়ে হাপায় বেশীরভাগ ডিমই নষ্ট হয়ে যায়, ডিমপোনা যা পাওয়া যায় তাও স্বাভাবিকভাবে বাড়ে না, পুকুরেও অনেক ডিমপোনা মারা যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সময় হলো, নভেম্বর মাস এবং তারপরে ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

১৯। কমন কার্প বা আমেরিকান রুই মাছের প্রজনন সরাসরি পুকুরেও করানো যায়, প্রজনন হাপা ব্যবহার না করেই। শীতকালে, বিশেষ করে শীতের মধ্যেই হঠাৎ ছ'একদিন একটু গরমের ভাব দেখা দিলে, কমন কার্পের স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে একসঙ্গে পুকুরের জলে ঘুরে বেড়াতে এবং মাঝে মাঝে পুকুরের কোণের দিকে এসে অল্প জলে লাফালাফি করতে দেখা যায়। এইরকম অবস্থায় পুকুরের চারকোণে বেশ কিছুটা জায়গায় জলের ওপর কচুরীপানা বিছিয়ে রাখতে হয় এবং সকালে পানা তুলে দেখতে হয় তাতে ডিম আটকে আছে কী না। ডিম দেখা গেলে ডিমসমেত কচুরীপানা পুকুর থেকে তুলে অন্য পুকুরে ডিম ফোটানোর হাপায় রাখা হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিম ফুটে ডিমপোনা বেরিয়ে আসে। ডিম ছাড়ার পুকুরেই ডিমসমেত কচুরীপানা ঐ অবস্থায় ফেলে রাখলে প্রায়ক্ষেত্রেই ডিমপোনা পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও সংখ্যায় খুবই কম, কারণ আমেরিকান রুই মাছ নিজেরাই ওই ডিম খেয়ে নেয়। পুকুরে গ্রাস কার্প থাকলেও ডিমের ঐ একই হাল হয়।

২০। শীতকালে আমেরিকান রুই মাছের ডিম ও ডিমপোনা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু মাছচাষীদের প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে পুকুরে ছাড়া ডিমপোনা থেকে চারাপোনা ও সর্বশেষ ফসল হিসাবে মাছ পাওয়া যায় অতি সামান্য। বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এর সঙ্গত কারণ আছে।

শীতকালে ও শীতের ঠিক শেষে যখন এই মাছের ডিমপোনা পাওয়া যায় তখন বেশীরভাগ পুকুরেই রুই, কাতলা ইত্যাদি নানা প্রজাতির মাছ থাকে। মাছচাষীরাও এই ডিমপোনার চাষের জন্য পৃথকভাবে আঁতুড় পুকুর তৈরী করেন না। চালামাছ বা আরও বড় সাইজের মাছ আছে এরকম যে-কোনো পুকুরেই আমেরিকান রুই-এর ডিমপোনা ছাড়া হয়। এইসব পুকুরে ডিমপোনার উপযুক্ত প্রাকৃতিক খাদ্য থাকে না। ফলে ডিমপোনা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য না পেয়ে মারা যায়। ছোট চারাপোনা কিনে পুকুরে ছেড়ে যারা চাষ করেন তাদেরও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া ওই সময় বেশীরভাগ পুকুরেরই জল কমে যায়, রোদের তাপে অনেক পুকুরেরই জল গরম হয়ে যায়। ডিমপোনা ও ছোট চারাপোনা এইরকম জলে স্বভাবতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, বর্ষাকালে আমেরিকান রুই-এর প্রজনন করানো হলে এইসব সমস্যা দেখা দেয় না। এইসময় মাছচাষীরা রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছের ডিমপোনা ও চারাপোনা চাষের জন্য আঁতুড় পুকুর ও লালনপুকুর তৈরী করেন বিশেষ প্রক্রিয়ায়। এইসব তৈরী পুকুরে আমেরিকান রুই-এর ডিমপোনা ও ছোট চারাপোনা ছাড়া হলে তারা শীতকালের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত বাড়ে, বাঁচার হার এবং চারাপোনা ও মাছের উৎপাদনের হারও শীতকালের তুলনায় অনেক বেশী হয়। এই সময়ে পুকুরে জল বেশী থাকায় জল গরম হওয়ারও আশংকা থাকে না। রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের মতো বর্ষার ৩-৪ মাস আগে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমেরিকান রুই মাছ সংগ্রহ করে কিছুটা গভীর পুকুরে রেখে উপযুক্ত পরিচর্যা দ্বারা ঐসব মাছকে প্রজননক্ষম ও সুপরিণত করে তোলা মোটেই কষ্টসাধ্য কাজ নয়।

২১। প্রণোদিত প্রজননের কাজে প্রজনন হাপা নাইলন দিয়ে তৈরী করা হলেও হ্যাচিং হাপা বা ডিম ফোটানোর হাপা মার্কিন কাপড় দিয়ে তৈরী করাই শ্রেয়।

২২। একবার ব্যবহার করার পর হাপা সোডা-সাবান দিয়ে ভালভাবে কেচে শুকিয়ে নিয়ে তবেই পুনরায় ব্যবহার করা উচিত। এইজন্য প্রণোদিত প্রজনন কাজের সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে অন্তত ৩-৪ সেট হাপা রাখা দরকার।

২৩। কমন কার্প বা আমেরিকান রুই মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি প্রণোদিত প্রজননের কাজে খুবই কার্যকরী। ফেব্রুয়ারী মাসে প্রজননক্ষম এই মাছ পুকুরে ও বাজারেও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সময় টাটকা এইসব মাছের গ্রন্থি সংগ্রহ করে জলশূন্য সুরাসারে সংরক্ষিত করে ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিলে মরশুমে কাজের সময় অনেক সুবিধা হয় ; গ্রন্থি সংগ্রহের জন্য দৈনিক বাজারে ছুটতে হয় না, কাজে সাফল্য লাভও হয় সন্তোষজনক।

২৪। একই প্রজনন হাপায় যতদূর সম্ভব একই সাইজের মাছ রাখা উচিত। সাইজের পার্থক্য খুব বেশী হলে অপেক্ষাকৃত ছোট মাছ সন্ত্রস্ত হয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে না ; এতে এদের ডিম দেওয়ার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রবণতা কিছুটা দমিত হতে পারে।

২৫। কৃত্রিম নিষিক্তকরণ পদ্ধতিতে স্ত্রী-মাছের পেট থেকে ডিম বার করে নেওয়ার সময় খুব আলগাভাবে চাপ দিতে হয়। তা সত্ত্বেও ডিমের সঙ্গে যদি রক্ত বা পিত্ত এসে যায়, সেই মুহূর্তেই ডিম নেওয়া বন্ধ করে দিতে হয়, কারণ ডিমের সঙ্গে রক্ত, পিত্ত বা অন্য যে-কোন পদার্থ মিশে গেলে সেই ডিমের সঙ্গে পুরুষ-মাছের শুক্ররস বা মিল্ট যতই মেশানো হোক না কেন ডিম নিষিক্ত হয় না।

২৬। প্রজননের জন্য উপযুক্ত বড় মাছ একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার কাজে পাত্র হিসাবে পলিথিন পুল ব্যবহারেই ঝুঁকি সবচেয়ে কম।

২৭। প্রণোদিত প্রজননের কাজের জন্য মাছ সংগ্রহ ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসের গোড়াতেই সেরে ফেলা উচিত। স্ত্রী-মাছের পেটে সম্পূর্ণ পরিমাণে ডিম এসে গেছে বা পুরুষ-মাছ উপযুক্তভাবে মিল্টযুক্ত হয়ে গেছে এইরকম অবস্থায় বেশী দূরত্বে মাছ পরিবহন

করা উচিত নয়। এতে পরিবহন কালে মাছ মারা যেতে পারে, পুকুরে ছাড়ার পরেও মাছ মরতে পারে এবং অনেক সময় মাছ সুপরিণত হওয়ার কাজে অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়ে মাছের অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে।

২৮। মাছের দেওয়া সব ডিম থেকেই ডিমপোনা পাওয়া যায় না। ডিম দেওয়ার ৩-৪ ঘণ্টা পরে নিষিক্ত ডিম ফুলে আকারে কিছুটা বড় হলে ভালভাবে লক্ষ্য করলে কাঁচের মত স্বচ্ছ, চক্‌চকে ডিমের মধ্যে একই সঙ্গে দুটি রং—নীল ও ধূসর—এবং ডিমের খোলায় ভেতরের ভ্রূণটি খোলার একপাশে (মাঝখানে নয়) দেখা যায়। এই-সব লক্ষণযুক্ত ডিম থেকে ডিমপোনা পাওয়া যায়।

২৯। জাভার পুঁটির প্রণোদিত প্রজননে পিটুইটারি গ্রন্থির ইন্‌জেকশন দিতে হয় স্ত্রী ও পুরুষ মাছকে সাধারণত মাত্র একবার এবং খুব কম মাত্রায়। স্ত্রী-মাছকে দেহের প্রতি কেজি ওজনের জন্য ৫-৬ মিলিগ্রাম এবং পুরুষ-মাছকে ২-৩ মিলিগ্রাম। ব্যবহৃত পুরুষ মাছের মোট সংখ্যার ৫০% মাছকে ইন্‌জেকশন দিলেই কাজ চলে। ইন্‌জেকশন দেওয়ার ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যেই স্ত্রী-মাছ ডিম দেয়। ডিম ও ডিমপোনার আকার খুব ছোট। ডিমপোনাকে ৩ দিনের পরিবর্তে ৫-৬ দিন হাপায় রাখা উচিত, প্রতিদিন হাপা বদল করে। এই সময় (২ দিনের পর) খাদ্য হিসাবে হাপায় অল্প অল্প পরিমাণে মিল্ক পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩০। প্রজননের উপযুক্ত সুপরিণত স্ত্রী গ্রাস কার্প নির্বাচন করার জন্য বাছাই করা বেশ কয়েকটি মাছ কাপড়ের হাপায় অন্তত ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে মলত্যাগের সঙ্গে মাছের পেট থেকে আধ-হজম ঝাঁঝি, ঘাস ইত্যাদি বেরিয়ে যায়। এরপর উদরের স্ফীতি ও অন্যান্য লক্ষণ দেখে সুপরিণত মাছ নির্বাচন করা হলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পুকুর থেকে মাছ ধরেই উদরের স্ফীতি দেখে সরাসরি মাছ নির্বাচন করা হলে ভুল নির্বাচনের যথেষ্ট আশংকা থাকে; কারণ প্রচুর পরিমাণে জলজ উদ্ভিদ, ঘাসপাতা

ইত্যাদি খাওয়ার ফলে এদের পেট প্রায় সব সময়েই কিছুটা ফোলা অবস্থায় থাকে।

৩১। প্রজননের কাজে ব্যবহৃত পুরুষ-মাছের মিল্ট খুব বেশী গাঢ়, সামান্য লালচে বা গোলাপী বা হলদে আভাযুক্ত বলে মনে হলে সেইসব পুরুষ-মাছ কখনই নির্বাচন করা উচিত নয়। বিশেষ করে গ্রাস কার্পের কিছু প্রজননক্ষম পুরুষ-মাছের মিল্টে এইরকম লক্ষণ দেখা যায়।

৩২। পুকুরে কাতলার চাপে সরষের খোল অথবা সুপার-ফসফেট, রুই-এর চাপে ইউরিয়া ও মৃগেলের চাপে পটাশ ব্যবহারে মাছের বৃদ্ধির হার দ্রুততর হয়।

৩৩। মরশুমের প্রথমদিকে জাপানী পুঁটি মাছের প্রজনন করানোর কর্মসূচি নেওয়া হলে অন্যান্য প্রজাতির মাছের মতোই স্ত্রী-মাছকে দু'বার ইন্‌জেকশন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। মরশুমের মাঝামাঝি সময়ে মাত্র একবার নক্-আউট মাত্রায় ইন্‌জেকশনেই প্রজনন করানো সম্ভব হয়।

৩৪। স্ট্রিপিং পদ্ধতিতে (স্ত্রী-মাছের পেটে চাপ দিয়ে ডিম বার করে নেওয়া) প্রজনন করানো হলে গ্রাস কার্পের ক্ষেত্রে ডিম ওয়াশ্ করা বা জল দিয়ে ধুয়ে বাড়তি মিল্ট ইত্যাদি অপসারণ করার কাজে ৬% লবণ জল ব্যবহারে ডিমপোনা উৎপাদনের হার বিচারে অধিক সুফল পাওয়া যায়।

৩৫। প্রজনন ও ডিম ফোটানোর কাজে ব্যবহৃত ইট, সিমেন্ট দিয়ে তৈরী হ্যাচারিও কয়েকদিন অন্তরই (৭-১০ দিন) চূণ ও পটাশ পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে এবং পরিষ্কারের পর সম্ভব হলে অন্তত একদিন ফেলে রেখে তারপর নতুন করে কাজে লাগানো উচিত।

উৎপাদনমুখী প্রকল্পে সরকারের আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য

মাছচাষ একটি স্বীকৃত লাভজনক বৃত্তি হিসাবে গণ্য হলেও চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, (ধানিপোনা/চারাপোনা) সার, সাজ-সরঞ্জাম (জাল, হাপা ইত্যাদি) ইত্যাদি সবকিছুরই দাম এবং জন-মজুরী অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মাছচাষ বর্তমানে বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। অনীহা, অজ্ঞতা ছাড়াও প্রধানত আর্থিক অনটনের কারণেই তাই অধিকাংশ মাছচাষীর পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকৌশল সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। এর ফলে মাছের ফলন আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় মাছচাষীদের পক্ষে তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করা যেমন সম্ভব হচ্ছে না তেমনি আবার সামগ্রিক-ভাবে রাজ্যের মাছের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির পথে এইসব অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যবিভাগ অনেকগুলি উৎপাদনমুখী প্রকল্প চালু করেছেন। এইসব প্রকল্প অনুযায়ী মাছচাষ করতে যারা আগ্রহী সরকারের তরফে তাদের নানা ধরনের আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগ্রহী মাছচাষী ও মৎস্য-জীবীরা তো বটে-ই, শিক্ষিত বেকার যুবকেরাও মাছচাষকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই রুজি-রোজগারের দিক থেকে স্ব-নির্ভর ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হলো :

১। চাষযোগ্য বা চালু জলাশয়ে ছয়-জাতীয় দেশী-বিদেশী মাছের নিবিড় মিশ্র চাষ ;

২। সংস্কারযোগ্য জলাশয়ে ১ ফুট মাটি কেটে চাষোপযোগী

করে নিয়ে ছয়-জাতীয় মাছের নিবিড় মিশ্র চাষ ;

৩। সংস্কারযোগ্য জলাশয়ে ২ ফুট পর্যন্ত মাটি কেটে চাষোপযোগী করে নিয়ে ছয়-জাতীয় মাছের নিবিড় মিশ্র চাষ ;

৪। সংস্কারযোগ্য জলাশয়ে ১ মিটার (৩ ফুটের সামান্য কিছু বেশী) পর্যন্ত পঙ্কোদ্ধার ও ছয়-জাতীয় মাছের নিবিড় মিশ্র চাষ।

রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা (ফিস্ ফারমার্স ডেভলপমেণ্ট এজেন্সি বা এফ্. এফ্. ডি. এ) গঠন করে ঐসব সংস্থার মাধ্যমে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকল্পে জেলার পুকুর সংস্কার ও আধুনিক উন্নত প্রথায় মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পে অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার এবং অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ সরকারী অনুদান হিসাবে পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। নিজ খরচে প্রকল্পের কাজ করা হলেও সমহারে সরকারী অনুদান পাওয়া যায়। অনুদানের টাকা প্রথমে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়, পরে উন্নয়নের কাজ শেষ হলে অনুদান হিসাবে ঋণের টাকা ছাড় দেওয়া হয়। ছোট, বড় সবরকম জলাশয় মালিকানা অথবা মেয়াদী বন্দোবস্ত হলেও প্রকল্পের আওতায় আনা যায়। তবে মেয়াদী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অন্তত দশ বছরের লীজ না থাকলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার অসুবিধা আছে।

যেসব জেলায় মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা (এফ্. এফ্. ডি. এ) গঠন করা এখনও হয়ে ওঠে নি সরকারের অন্যান্য সংস্থা, যথা—এ. আর. ডি. সি (বর্তমানে ন্যাবার্ড), আই. আর. ডি. সি ইত্যাদির মাধ্যমে উপরোক্ত প্রকল্পগুলির কাজ করার ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রেও অনুমিত খরচের ৭৫ শতাংশ ব্যাঙ্ক-ঋণ ও ২৫ শতাংশ অনুদান হিসাবে পাওয়া যায়।

সব জেলাতেই উন্নয়নমুখী আর যেসব মাছচাষের প্রকল্প চালু আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

প্রজননক্ষম মৎস্যপালন এবং প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে ডিমপোনা উৎপাদন প্রকল্প, ধানিপোনা উৎপাদনের জন্য আঁতুড় পুকুর পরিচালন প্রকল্প এবং অগভীর আধা হাজা-মজা পুকুরে জিওল মাছ (শিঙ্গী ও মাগুর) চাষ প্রকল্প। এসব প্রকল্পেও মাছচাষীকে অনুমিত

মোট খরচের শতকরা ২৫ ভাগ সরকারী অনুদান হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাকি ৭৫ ভাগ ব্যয় মাছচাষী নিজে বহন করবেন অথবা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে অথবা আংশিক নিজ অর্থ ও আংশিক ব্যাঙ্কঋণ নিয়ে মেটাবেন।

পূর্ব-বর্ণিত প্রকল্পগুলির সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও যে-কোনো ব্যক্তি, মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠী অথবা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি নিজেদের আঁতুড় পুকুরে উন্নতমানের ধানিপোনা উৎপাদনের অথবা লালন-পুকুরে ধানিপোনা চাষ করে চারাপোনা উৎপাদনের অথবা পালন বা মজুত পুকুরে নিবিড় মিশ্র মাছচাষের উন্নত ধরনের চাষ-পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ কৌশল প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শনক্ষেত্র স্থাপন করে কারিগরী সাহায্য ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা লাভ করতে পারেন। এক্ষেত্রেও অনুমিত ব্যয়ের অনেকটাই সরকার বহন করেন, উৎপাদককে অনুদান দিয়ে।

এছাড়া 'মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠন' প্রকল্পের মাধ্যমেও স্বল্প আয়ের ও অন্যভাবে অসুবিধাগ্রস্ত মাছচাষীদের আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ৮-১০ জন মৎস্যচাষী এই ধরনের গোষ্ঠী গঠন করে জেলা মৎস্যচাষ আধিকারিকের দ্বারা ঐ গোষ্ঠী নথিভুক্ত করিয়ে নেওয়ার পর সরকারী/আধা সরকারী/সমবায় সমিতির আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য পেতে পারবেন। প্রতি সংস্থা বা গ্রুপে কমপক্ষে ৩০ বিঘা নিজেদের মালিকানায় বা লীজ নেওয়া জলা থাকা দরকার। গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের কাছ থেকেও সরকারের খাস পুকুর/জলাশয় বন্দোবস্ত নিয়ে সভ্যদের মধ্যে পরিচালনার ভার দিতে পারে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবকেরাও এই ধরনের গোষ্ঠী গঠন করে মাছচাষের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর হয়ে উঠতে পারেন। আর্থিক সহায়তা ও অনুদানের মাধ্যমে এইসব উৎপাদন-গোষ্ঠীকে মাছ ধরার জাল, প্রণোদিত প্রজনন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় হাপা, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে গ্রাম-গঞ্জে অন্যান্য

মাছচাষীদের প্রয়োজনে এইসব সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া দিয়ে গোষ্ঠী নিজেদের বাড়তি আয়েরও সংস্থান করতে পারে।

মৎস্যজীবীরা প্রধানত গরীব। তাই প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিয়ে গঠিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি যাতে সুষ্ঠভাবে মাছচাষ করে মাছের উৎপাদন বাড়াতে এবং সভ্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে সেজন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছেন। প্রাথমিক সমিতিগুলি তাদের সভ্যদের দেওয়া অংশগত মূলধনের দ্বিগুণ বা দশ হাজার টাকা যেটি কম সেই টাকা রাজ্য সরকারের অংশগত মূলধন হিসাবে পায়। এছাড়া প্রয়োজনীয় জাল ও নৌকা কিনবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় সেই টাকা সরকারের কাছ থেকে ৭৫ শতাংশ ঋণ এবং ২৫ শতাংশ অনুদান হিসাবে পাওয়া যায়। গুদাম নির্মাণের জন্য, ট্রাক ইত্যাদি কেনার জন্য এবং জলাশয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ ও অনুদান অথবা অংশগত মূলধন অথবা শেয়ার ও অনুদান হিসাবে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সরকারের কাছ থেকে পেতে পারে। সমিতির গরীব সভ্যদের নিজস্ব জলাশয় না থাকায় সরকার নিজে মালিকানাধীন জলাশয় কেবলমাত্র মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য আইনগত ব্যবস্থাও নিয়েছেন।

আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পূর্ব-বর্ণিত বিভিন্ন প্রকল্প ছাড়াও মৎস্য চাষ-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার প্রতি জেলায় মৎস্যচাষে উৎসাহী ব্যক্তিদের, মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠীকে, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের হাতে-কলমে মাছচাষে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন প্রকল্পের বিশদ বিবরণ, আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য ছাপানো আবেদনপত্র ইত্যাদি প্রতিটি ব্লক উন্নয়ন অফিসে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক (এফ ই. ও) এর নিকট পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে জেলা মৎস্যচাষ আধিকারিক (ডি. এফ ও) কিংবা মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থার (এফ. এফ ডি. এ) মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের (চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার) সঙ্গেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মাছচাষে অগ্রগতি ও কিছু চিন্তা-ভাবনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে গত দু'দশকে আমাদের দেশে মাছচাষে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে; আবার এ কথাও সত্য যে সেই সঙ্গে কৃষি ও শিল্পের মতই কিছু কিছু অস্বস্তিকর সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে এই অগ্রগতির উপজাত পদার্থ হিসাবে। এই সব সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক আশু সমাধান দরকার, অন্যথায় অগ্রগতির সুফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না, সমস্যার সন্তান-সন্ততিরাই খেয়ে নেবে সুফলের সিংহভাগ।

কাতলা ও সিলভার কার্পের মিশ্র চাষ : কাতলা ও সিলভার কার্প মাছের মিশ্র চাষে কাতলার বৃদ্ধি তথা উৎপাদনের অধঃগতি মিশ্র মাছচাষ প্রযুক্তির উপজাত এইরকমই একটি জটিল সমস্যা। বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত ১ (কাতলা) : ২ (সিঃ কার্প) অনুপাতে চাষে কাতলার উৎপাদন যে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে-কথা অনস্বীকার্য। বস্তুতপক্ষে সিলভার কার্পের সঙ্গে মিশ্র চাষে বছরে মাত্র ৫০০ গ্রাম ওজনের কাতলা মাছ পুকুর থেকে খুঁজে বার করা রীতিমত পরিশ্রমসাধ্য কাজ। অথচ সিলভার কার্প ছাড়া রুই, মৃগেল, গ্রাস কার্প ইত্যাদি অন্যান্য প্রজাতির মাছের সঙ্গে মিশ্র চাষে বছরে কমপক্ষে এক কেজি ওজনের কাতলা মাছের উৎপাদন প্রায় অধিকাংশ পুকুরেই সম্ভব।

পুকুরে সৃষ্ট উদ্ভিজ্জ খাদ্যাণুর সদ্ব্যবহারের জন্য সিলভার কার্প মাছের কোন বিকল্প নেই একথা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েও বলা যায় যে বাঙালীর অতি প্রিয় ও মূল্যবান কাতলা মাছের উৎপাদনের এই অবক্ষয় মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ, দামের বিচারে মাছের বাজারেই হোক বা স্বাদের বিশ্লেষণে ভাতের পাতেই হোক, সিলভার কার্প কোনদিনই কাতলার স্থান নিতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে

প্রফেসর গুটম্যানের সতর্কবাণী স্মরণ করা যেতে পারে, 'টেকনলজি না জানলে দেশ এগোয় না, আবার দেশকে না জানলে টেকনলজি এগোয় না।' আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবাংলায় কাতলা ও সিলভার কার্পের মিশ্র চাষজনিত সমস্যার কথা চিন্তা করে এই দুই প্রজাতির পুকুরে ছাড়া চারাপোনার সংখ্যার অনুপাতের তারতম্য ঘটিয়ে, চারাপোনা আগু-পিছু করে পুকুরে ছেড়ে, কোন একটি প্রজাতির ফসল মাঝে মাঝে আংশিকভাবে পুকুর থেকে তুলে নিয়ে, অথবা এই জাতীয় নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা আশু ও একান্ত দরকার এবং এই বিষয়ে মৎস্যবিজ্ঞানী ও গবেষকদের চিন্তা-ভাবনা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে হয়।

মহুয়া খোলের নির্বিচারে ব্যবহার : মৎস্যভূক মাছ মারবার জন্য পুকুরে মহুয়া খোল ব্যবহার করা হয়। পুকুরের যাবতীয় মাছ মেরে ফেলা ছাড়াও পুকুরের জলে পচে এই খোল উৎকৃষ্ট সারেরও কাজ করে। বিশেষ এই গুণের জন্যে মাছ ছাড়ার আগে পুকুর তৈরীর কাজে এই খোলের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। ডিমপোনা ও চারাপোনার চাষে আঁতুড় পুকুর ও লালন পুকুর তৈরীর জন্য মহুয়া খোলের ব্যবহার অপরিহার্য ঠিকই, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বড় মাছ চাষের মজুত পুকুর তৈরীর কাজেও এই খোল নির্বিচারে ব্যবহার করা হচ্ছে। চাষের ধরন অনুযায়ী এই খোল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে কীনা সে সম্বন্ধে কোন বিচার-বিশ্লেষণ না করেই পুকুর নির্বিশেষে মহুয়া খোল ব্যবহার করার ফলে পুকুরের কয়েকটি মূল্যবান চুনো মাছের বংশ প্রায় লোপ পেতে বসেছে। মৌরলা, পুঁটি ও ট্যাংরা মাছের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা যে শুধু সুস্বাদু মাছ তাই নয়, পুষ্টির দিক থেকেও এরা যে-কোন নামী-দামী মাছের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তাছাড়া একথাও তো ঠিক যে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারের মাছ খাওয়ার সাধ এরাই তো এতদিন পূরণ করে এসেছে, আবার উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালীদের মাছ খাওয়ার স্বাদ পরিবর্তনের প্রয়োজনেও এগিয়ে এসেছে।

আজকাল অধিকাংশ পুকুর বাঁধের ও প্রণোদিত প্রজননের

মাধ্যমে উৎপন্ন চাষোপযোগী মাছের ডিমপোনা দিয়ে চাষ করার ফলে এইসব পুকুরে মৎস্যভূক মাছের উপস্থিতির প্রশ্নই ওঠে না। স্বভাবতই মৎস্যভূক মাছ থেকে মুক্ত এইসব পুকুর তৈরীর কাজে মহুয়া খোলের ব্যবহার মোটেই অপরিহার্য নয়, বরং মূল্যবান চুনো মাছের অস্তিত্বের স্বার্থে গোবর অথবা সরষের খোল দিয়ে এইসব পুকুর তৈরী করা যেতে পারে। এছাড়া একবার মহুয়া খোল ব্যবহার করে এবং কেবলমাত্র চাষোপযোগী মাছের চারাপোনা পুকুরে ছেড়ে চাষ করে ফসল তুলে নেওয়ার পর পরের বছরে পরবর্তীকালেও ঐ পুকুরে মহুয়া খোল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না, যদি না বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে বাইরের জলাশয়ের মাছ ভেসে এসে ঐ পুকুরে আশ্রয় নেয়। এইভাবে কেবলমাত্র আঁতুড় পুকুর ও লালন পুকুর এবং বিশেষক্ষেত্রে কিছু কিছু মজুত পুকুরের মধ্যেই মহুয়া খোলের ব্যবহার সীমায়িত রাখা হলো এবং অধিকাংশ মজুত পুকুর গোবর বা সরষের খোল দিয়ে তৈরী করে চাষ করা হলে অচিরেই মাছের বাজারে আবার মৌরলা, পুঁটি ও ট্যাংরা জাতীয় মূল্যবান চুনো মাছের আমদানী উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে এবং এতে বাঙালী মৎস্যভোজী মাত্রই উপকৃত ও সুখী হবেন। অপরপক্ষে বর্তমানের ন্যায় পুকুর নির্বিশেষে মহুয়া খোলের ব্যবহার অব্যাহত থাকলে খুব নিকট ভবিষ্যতেই ঐ সব মূল্যবান চুনো মাছের অস্তিত্ব পশ্চিমবাংলার পুকুর থেকে চিরতরে মুছে যাবে।

মজুত পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছের চাষের সঙ্গে চুনো মাছের উপস্থিতি বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষের কতটা সমার্থক হবে সে সম্বন্ধে স্বভাবতই কিছু কিছু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। ট্যাংরা মাছের কিছুটা মাছখেকো স্বভাবও আছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে মজুত পুকুরে অপেক্ষাকৃত বড় আকারেরই (৪″-৫″ ইঞ্চি) চারাপোনা ছাড়া হয়। পুকুরের ট্যাংরা আকারে ছোট, এরা ওই চারাপোনার ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখা দিতে পারে মাছের খাদ্যের ব্যবহার সম্পর্কে। চুনো মাছ অবশ্যই পুকুরে চাষোপযোগী মাছের খাদ্যে কিছুটা ভাগ বসাবে। কিন্তু একথাও তো ঠিক যে মৌরলা, পুঁটি বা ট্যাংরা চুনো মাছ হলেও মোটেই অবাঞ্ছিত মাছ নয়, বরং বলা যায় এরা বহু আকাঙ্ক্ষিত মাছ।

তাছাড়া বাজারে এইসব চুনো মাছের চাহিদাও যেমন বেশী, বিক্রিও হয় তেমনি চড়া দামে। সুতরাং এদের ধ্বংস না করে এদের জন্যে পুকুরে কিছু বাড়তি খাদ্যের যোগানের ব্যবস্থা করাই সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত। এইসব চুনো মাছের জীবনচক্রও খুব ছোট। জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই পুকুর থেকে তুলে এদের বাজারে পাঠানো হয়। খাদ্যের ওপর চাপ স্বভাবতই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এই প্রসঙ্গে সর্ব-শেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। যে শোল, শালকে অবাঞ্ছিত মাছ বলে মহুয়া খোল দিয়ে মেরে পুকুরে থেকে নির্মূল করা হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়, সেই শোল, শাল মাছেরই যত্ন করে চাষ করা হয় পুকুরে অন্য কয়েকটি রাজ্যে সেখানকার মৎস্যভোজীদের স্বার্থে। পশ্চিমবাংলায় বাঙালী মৎস্যভোজীদের স্বার্থেই বা মৌরলা, পুঁটি বা ট্যাংরা মাছকে অবলুপ্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে না কেন? এই পরিপ্রেক্ষিতে পুকুরে মহুয়া খোলের ব্যবহার সম্বন্ধে মৎস্যবিজ্ঞানী ও মাছচাষীদের নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়।

মাছের ডিমপোনা ও মাছের উৎপাদন : প্রণোদিত প্রজনন প্রযুক্তির সুবাদে মাছে ডিমপোনার উৎপাদন ইদানিংকালে উল্লেখ-যোগ্য ভাবে বেড়েছে। বস্তুতপক্ষে পশ্চিমবাংলায় পুকুরে চাষের জন্যে যে পরিমাণ ডিমপোনার প্রয়োজন হয় তার সিংহভাগটাই আসে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ নামে পরিচিত এইসব বিশেষ ধরনের তৈরী করা জলাশয় থেকে। মাছচাষে এই সন্দেহাতীত অগ্রগতি ডিমপোনা সংগ্রহের সমস্যা সমাধানে আশাতীত সাহায্য করলেও নতুন কিছু সমস্যারও সৃষ্টি করেছে, মানুষেরই অদূর-দর্শিতা ও হটকারিতার ফলে।

বিশেষ ধরনের মাটির প্রভাবে এমনিই বাঁকুড়া জেলায় রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি দেশী মাছ একবছর বয়সের মধ্যেই প্রজনন-ক্ষম হয়ে ওঠে। এর ওপর অতিরিক্ত মুনাফার স্বার্থে পুকুরে মাত্রাধিক্য সংখ্যায় মাছ মজুত করে রাখার ফলে দিন দিনই মাছ অস্বাভাবিক ভাবে ছোট আকার প্রাপ্ত হচ্ছে। এছাড়া আছে ইন্-ব্রীডিংজনিত সমস্যা, অর্থাৎ, একই মাছ থেকে পাওয়া ডিমপোনা ও বাচ্চাদের বড় করে সেই একই পরিবারের মাছের মধ্যেই তাদের প্রজনন ক্রিয়া

করানোর ফলে উদ্ভূত সমস্যা। এইসবের ফলে অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে সামান্য মাত্র ২০০-২৫০ গ্রাম ওজনের রুই, মৃগেল বা ৪০০-৫০০ গ্রাম ওজনের কাতলা মাছের পেটে ডিম এসে যায় এবং এই সব অতি ছোট আকারের মাছও প্রজননের জন্য বাঁধে নির্বিচারে ব্যবহার করা হয় ব্যক্তিগত লাভের অঙ্ক বাড়াবার উদ্দেশ্যে। তিন কেজি ওজনের একটি মাছের প্রজননে পাওয়া বাচ্চা যত দ্রুত বাড়বে এবং নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে যে আকার ও ওজন প্রাপ্ত হবে, ২৫০ গ্রামের বা এক কেজি ওজনের মাছ থেকে পাওয়া বাচ্চা যে সেই হারে বাড়বে না এ তো স্বতঃসিদ্ধ। স্বাভাবিক কারণেই আজকাল তাই মাছচাষীদের কাছে প্রায়ই শোনা যায় যে বাঁকুড়ার বাঁধের ডিমপোনা ছেড়ে চাষ করে তাদের পুকুরে মাছ বাড়ছে না।

সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজতে হবে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী উভয় প্রকার পরিকল্পনার মাধ্যমে। প্রগতিশীল কিছু বাঁধ-মালিকদের কারিগরি ও অনুদান হিসেবে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বিনিময়ে তাদের বাঁধে কেবলমাত্র বড় আকার ও ওজনের মাছের (কাতলা কমপক্ষে ২ কেজি, রুই ১॥ কেজি ও মৃগেল ১ কেজি) প্রজননের ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিছুটা সরকারী তদারকি ও উদার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। এইসব বাঁধের মালিকদের অতিরিক্ত লাভের স্বার্থত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে বাঁধের পরিচয় মাছচাষীদের জানানো ও তাদের এইসব বাঁধের ডিমপোনা কেনার জন্যে অনুরোধ করা যেতে পারে। সরকারী প্রশংসাপত্রের সুবাদে উৎকৃষ্ট মানের এইসব ডিমপোনা বাজার প্রচলিত দামের চেয়ে কিছুটা বেশী দামেও বিক্রি হতে পারে বলে আশা করা যায়।

দীর্ঘমেয়াদী উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের সঙ্গেই বিভিন্ন জেলায় সরকারের নিজস্ব মৎস্য ও মৎস্যবীজ উৎপাদনের খামারে বড় আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প মাছের প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে ডিমপোনার উৎপাদন এবং সেইসব ডিমপোনা সুলভ মূল্যে সরাসরি মাছচাষীদের সরবরাহ করার কর্মসূচীও গ্রহণ করা দরকার। এ ছাড়াও প্রয়োজনবোধে

আইন প্রণয়ন করে এক কেজির কম ওজনের রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প মাছের প্রণোদিত প্রজনন নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মাছের দেহের ওজন যত বেশী হবে তার পেটে উৎপন্ন ডিমের সংখ্যা ও সেই ডিম থেকে ডিমপোনা উৎপাদনের হার তত বেশী হবে; আর, এই ডিমপোনার উৎপাদন ও দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রণোদিত প্রজননে মাছের জাত-পাতের বিচার ঃ প্রণোদিত প্রজনন প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগে আমাদের দেশে বর্তমানে মাছের ডিমপোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে মাছচাষের এই কল্যাণকর কর্মকাণ্ডে মাছের জাত-পাতের বিচার স্পষ্টতই লক্ষণীয়। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় উচ্চবর্ণের দেশী মাছ, রুই, কাতলা, মৃগেল এবং সম্মানিত বিদেশী মাছ, সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্প ছাড়া প্রণোদিত প্রজনন কর্মশালায় অন্য কোন প্রজাতির প্রবেশের অধিকার নেই বললেই চলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে এই অহেতুক রক্ষণশীলতার ফলে একদিকে যেমন কিছু কিছু মূল্যবান মাছের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে অপরদিকে তেমনি কিছু অতি লোভনীয় ভাল জাতের মাছের চাষের সম্প্রসারণের পথও অবরুদ্ধ।

পাবদা এই জাতীয় একটি মূল্যবান সুস্বাদু মাছ যা আক্ষরিক অর্থে বাজার থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সাধারণ বাটা ও ভাঙ্গন বাটাও আজকাল বাজারে খুব কম দিনই দেখা যায়। লোভনীয়, অতি মূল্যবান মাগুর মাছ ও মিষ্টিজলের গলদা চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণের প্রধান বাধাই হলো এদের বীজের দুষ্প্রাপ্যতা। মূল্যবান এইসব প্রজাতির মাছকে তপশীল জাতিভূক্ত মাছ হিসাবে গণ্য না করে প্রণোদিত প্রজনন কর্মকাণ্ডে এদেরও যথাযথ স্থান করে দেওয়া এবং সকল প্রজননের মাধ্যমে এদের বংশবৃদ্ধি ও চাষের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার সামগ্রিকভাবে মাছচাষে অগ্রগতির স্বার্থে।

উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস বনাম পরিবেশ ঃ সার ও পুষ্টিকর

কৃত্রিম খাদ্যই হলো মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির দুটি প্রধান শক্তিশালী হাতিয়ার। স্বভাবতই পুকুরে মাছচাষে এদের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে আরও বাড়বে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে পুকুরের জলের রাসায়নিক অবস্থার ওপর এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া, মাছের বাড়তি মল ও আবর্জনা অপসারণ ও অক্সিজেনের ঘাটতি ইত্যাদি নানাজাতীয় পরিবেশ-মূলক সমস্যারও উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। এইসব সমস্যা সম্বন্ধে 'পুকুরে সার প্রয়োগ' এবং 'মাছকে কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব সমস্যা সমাধানের পন্থা এবং সেইমত মাছচাষীদের সঠিক নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করার বিষয়ে মৎস্য-বিজ্ঞানী ও গবেষকদের চিন্তা-ভাবনা করার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে-বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। এইসঙ্গে আমাদের দেশের পুকুরে মাছচাষে উৎপাদন ব্যয় কমানো ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে জৈব সারের ব্যবহার কিছুটা কমিয়ে বর্তমানের তুলনায় আরও বেশী পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহারের কথাও চিন্তা করা দরকার।

মাছ-চাষ ও গবেষণা ঃ কৃষিকাজেই হোক বা শিল্পেই হোক সুসংহত ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতির জন্য নিরন্তন গবেষণা যে একান্ত প্রয়োজন সে-কথা আজ অনস্বীকার্য। বস্তুতপক্ষে প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারের কৃষি-গবেষণা শাখা ছাড়াও আমাদের দেশের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও কৃষি-সম্পর্কিত বিষয়ে নানা ধরনের গবেষণা করা হয়। শিল্পক্ষেত্রেও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা আজ শুধু স্বীকৃতই নয়, প্রতিটি শিল্পেই গবেষণা ও উন্নয়ন (আর. এ্যাণ্ড ডি.) শাখা এখন একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মাছচাষ একাধারে যেমন কৃষিকাজের মতোই একটি বিশেষ ধরনের চাষ-সম্পর্কিত ফলিত বিজ্ঞান, তেমনি এই চাষের বহুমুখীতার গুণে মাছচাষ একটি শিল্পও বটে। অথচ, মাছ-চাষের পীঠস্থান পশ্চিমবাংলায় মাছচাষ সম্পর্কিত গবেষণার কাজ দিন দিন অত্যন্ত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। বস্তুত চাষের নতুন নতুন প্রকৌশল বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মাছ-চাষীর কাছে সেগুলি পৌঁছে দেওয়ার যে প্রয়োজন আছে সে-কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি এবং এই ধরনের আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব

নিয়ে চলার ফলে আমরা যে শুধু চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি মাছচাষে উন্নত দেশগুলির চেয়ে বহুদূর পিছিয়ে পড়ছি তাই নয়, উৎপাদনের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আর, এরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হলো, একটি নয়, দু'টিও নয়, ছ-ছ'টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরেও রাজ্যের মৎস্যভোজীদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য মাছের জন্য অন্যান্য রাজ্যের সরবরাহের ওপর আজও আমাদের অসহায় নির্ভরতা এবং এই সরবরাহের অনিশ্চয়তা ও অপ্রতুলতার সুবাদে বাজারে মাছের আকাশছোঁয়া দর। গবেষণার মদত ছাড়া সম্প্রসারণের কাজ কখনোই অর্থবহ হতে পারে না, বরং গবেষণাকে গুরুত্বহীন করে শুধু সম্প্রসারণের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়াস গাড়ীর আগে ঘোড়া জুড়ে গাড়ী চালাবার চেষ্টা করার মতোই হাস্যকর। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মাছচাষীদের এবং সামগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সরকারী উদ্যোগে মাছচাষ সম্পর্কে সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে গবেষণার কাজ নতুন করে শুরু করা দরকার। গবেষণার চরিত্র ও রীতি বদলানোও জরুরি প্রয়োজন। গবেষণার জন্যই গবেষণা নয়, এমন গবেষণাই কাম্য যা মাছচাষীদের কাজে লাগে। 'একজনকে একদিন মাছ খাইয়ে লাভ নেই, বরং তাকে মাছ ধরা শেখাও'—চীন দেশের এই প্রবাদ বাক্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্য নয়, রাজ্যের সীমিত জলাভূমিতে মাছের উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি এবং সেই লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছানোর জন্যই গবেষণা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গবেষণার জন্য যেসব বিষয় ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয় মাছচাষীর প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে বা উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নাই বললেই চলে। এর প্রধান কারণ হোলো, সরকারী বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা ও গবেষণা শাখার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। সরকারের মৎস্যবিভাগের সম্প্রসারণ শাখা যেন জানেই না যে ঐ বিভাগেরই অধীনস্থ গবেষণা কেন্দ্রে কোন্ বিষয়ে বা কোন্ পথে গবেষণা চলছে। আবার, গবেষণা কেন্দ্রও গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্প্রসারণ শাখার মাধ্যমে মাছচাষীর পুকুরে পৌঁছে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। স্বভাবতই, এই অবস্থায় যাদের স্বার্থে বিপুল অর্থব্যয়ে গবেষণা ও সম্প্রসারণের

বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় সেই মাছচাষীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসবের সুফল পান না। অর্থ, সময় ও শক্তির এই অনভিপ্রেত অপচয় রোধ করা অবশ্যই দরকার এবং তা করতে হলে সর্বাগ্রে একান্তভাবে প্রয়োজন গবেষণা কেন্দ্র ও সম্প্রসারণ শাখার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ও কাজের সমন্বয় সাধন। গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন এমনভাবে হওয়া দরকার যাতে গবেষণালব্ধ ফলাফল অতি প্রত্যক্ষভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা মাছচাষীর অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি বিধানে সাহায্য করে।

নতুন নতুন প্রকৌশল বা 'টেকনোলজি' প্রয়োগ করে ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় মাছচাষীরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, কিংবা পুকুরের জল, মাটির গুণাগুণ, মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কীয় বা এই জাতীয় যেসব বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে তাদের সুষ্ঠ সমাধানই হওয়া উচিত মাছচাষ গবেষণার বিষয়বস্তু এবং এই সব সমস্যাগুলি মাছচাষের গবেষণাগারে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব অবশ্যই সম্প্রসারণ শাখার। অর্থাৎ, মৎস্য-চাষ বিজ্ঞানীরা যেমন সম্প্রসারণ শাখাকে গবেষণালব্ধ নতুন নতুন 'টেকনোলজি ফিড' করিয়ে যাবেন ঠিক তেমনি সম্প্রসারণ শাখার কর্মীরাও সেই সব 'টেকনোলজি' মাছচাষীকে হাতে-কলমে শিখিয়ে তাদের পুকুরে পৌঁছে দেবেন এবং এতে মাছচাষীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে কতটা লাভবান হলেন তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরবেন। সেইসঙ্গে মাছচাষীর পুকুরের সমস্যাগুলিকেও 'ফিডব্যাক' করিয়ে মৎস্য-চাষ গবেষণাগারে পৌঁছে দেবেন। বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলতে গেলে ল্যাব টু ল্যাণ্ড এবং ল্যাণ্ড টু ল্যাব প্রকল্প চলবে হাত ধরাধরি করে, একে অপরের সার্থক পরিপূরক হিসাবে। একমাত্র এইরকম অর্থবহ কাজের পরিবেশেই গবেষণা হয়ে উঠবে সত্যকারের কল্যাণধর্মী, মাছচাষীর প্রকৃত বন্ধু ও পথ-নির্দেশক।
